মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

নারী



নারী

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

খায়রুন প্রকাশনী
বিক্রয় কেন্দ্র ঃ বুক্‌স এন্ড কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
দোকান নং- ২০৯, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা -১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫৯৮২, ৮৩৫৪১৯৬, ০১৭১৫-১৯১৪৭৭ , ০১৯২১-০৯২৪৬৭

নারী

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

প্রকাশকাল ঃ

প্রথম ঃ জুলাই ১৯৯০

৮ প্রকাশ

মে ঃ ২০০৮

জ্যৈষ্ঠ ঃ ১৪১৫

সমাদিউস সানি ঃ ১৪২৯

প্রকাশক ঃ

রোকসানা বেগম

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ

আবদুল্লাহ যুবাইর

শব্দ বিন্যাস ঃ

মোস্তাফা কম্পিউটার্স

১০/ই-এ/১ মধুবাগ, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মুদ্রণ ঃ

আফতাব আর্ট প্রেস, ২৬ তনুগঞ্জ লেন, ঢাকা

ISBN 984-8455-36-6

মূল্য ঃ ৭০.০০ টাকা

পূর্ব-কথা

নারী ও পুরুষ অখন্ড মানব সমাজের দুটি অপরিহার্য অঙ্গ। এই দুটি অঙ্গই একে অপরের পরিপূরক। এর কোনটিকে বাদ দিয়েই মানব সমাজ পূর্ণত্ব অর্জন করতে পারে না। এ কারণেই নারী-পুরুষের সুষম উন্নয়ণ সমাজ-প্রগতির একটি অনিবার্য পূর্বশর্ত।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, নারী-পুরুষের সুষম উন্নয়ণ তথা সমাজ-প্রগতিতে নারীর ভূমিকা কোথায় ও কতটুকু? এর অর্থ কি নারীকে পুরুষের বিকল্প সত্তা রূপে গড়ে তোলা এবং তার উপর একই রূপ দায়িত্ব ও কর্তব্য-ভার ন্যস্ত করা? অথবা নারীর নিজস্ব সত্তাকে পুরোপুরি অক্ষুন্ন রেখে তাকে উন্নয়ন ও প্রগতির ধারাক্রমে সম্পৃক্ত করা? মূলতঃ এ প্রশ্নের সুষ্ঠু জবাবের উপরই নারীর সার্বিক উন্নতি ও অগ্রগতি এবং সমাজ-প্রগতিতে তার কাংক্ষিত ভূমিকাটি নির্ভর করে।

মহান ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক হযরত মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটিরই জবাব দিয়েছেন 'নারী' শীর্ষক তাঁর এই মূল্যবান ও গবেষণাধর্মী গ্রন্থটিতে। তিনি জীববিদ্যা, সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাস থেকে অজস্র তত্ত্ব ও তথ্য উপস্থাপন করে এ সত্যে উপনীত হয়েছেন যে, নারীকে নারী রূপে গণ্য করা এবং তাকে পুরুষের বিকল্প না ভাবাই প্রকৃতি ও বাস্তবতার ঐকান্তিক দাবি। নারীকে তার স্বভাবসম্মত দায়িত্ব পালন করতে দেয়া এবং সমাজ-প্রগতিতে তার যোগ্য ভূমিকাকে নিশ্চিত করাই মানব জাতির পক্ষে সর্বতোভাবে কল্যাণকর।

এ প্রসঙ্গে তিনি ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কেও বিস্তৃতভাবে আলোকপাত করেছেন। তিনি স্পষ্টতঃই বলেছেন যে, ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর আসল কর্মক্ষেত্র পরিবার হলেও প্রয়োজনে সে নৈতিক সীমারেখা মেনে সামাজিক কর্মকান্ডেও অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে কোন অজুহাতেই সে তার স্বভাবসম্মত দায়িত্ব ও কর্তব্য পরিহার করতে পারে না। প্রসঙ্গতঃ তিনি নারী-পুরুষ সম্পর্ক বিষয়ে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি এবং যৌন সমস্যার ইসলামী সমাধান সম্পর্কেও অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন এ গ্রন্থে।

বস্তুতঃ নারী-পুরুষ সম্পর্ক, বিশেষতঃ নারীর অধিকার ও মর্যাদা বিষয়ে 'নারী' একখানি অনবদ্য গ্রন্থ। এর পাতায় পাতায় গ্রন্থকারের সংস্কারক, দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক মানসের পরিচয় বিধৃত। একজন গবেষকের মন নিয়ে তিনি সমগ্র বিষয়টি পর্যালোচনা করেছেন পুংখানুপুংখ রূপে এবং মূল সমস্যার বাস্তব ও যুক্তিগ্রাহ্য সমাধান পেশ করেছেন অকুতোভয়ে। সেই সঙ্গে গোটা বিষয়টিকে

অনাবিল দৃষ্টিতে গ্রহণ করার জন্যে তিনি দেশের নারী সমাজ, সমাজ-সংস্কারক ও রাষ্ট্র-নায়কদের কাছে রেখেছেন আকুল আবেদন।

গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৮ সালে এবং তার সমুদয় কপি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল বহু পূর্বেই। বর্তমান সংস্করণে আমরা পূর্বেকার মুদ্রণ-প্রমাদগুলো সংশোধনের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এছাড়া গ্রন্থের অঙ্গসজ্জা ও মুদ্রণ-পারিপাট্য উন্নত করার জন্যেও আমরা বিশেষ যত্ন নিয়েছি। বর্তমান মুদ্রণ ব্যয়ের আলোকে এর মূল্যও অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য সীমার মধ্যে রাখা হয়েছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, গ্রন্থটির বর্তমান সংস্করণ পাঠকদের কাছে পূর্বাপেক্ষা অধিক সমাদৃত হবে।

মহান আল্লাহ গ্রন্থকারের এই দ্বীনী খেদমত কবুল করুন এবং এর বিনিময়ে তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌসে স্থান দিন, এটাই সানুনয় প্রার্থনা।

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
চেয়ারম্যান,
মওলানা আবদুর রহীম ফাউন্ডেশন

ঢাকাঃ আগষ্ট,১৯৯৪

শুরু কথা

'নারী' আমার সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ে লিখিত অতি গবেষণাপূর্ণ ও বিপুল তত্ত্ব ও তথ্য সম্বলিত একটি গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানি বিশেষভাবে এদেশের নারী সমাজের এবং সাধারণভাবে দেশের সমাজ সংস্কারক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও রাষ্ট্র পরিচালকদের হাতে তুলে দিয়ে নিজের দায়িত্ব পালন ও কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ্‌র নিকট জবাবদিহি থেকে নিষ্কৃতি লাভের উপায় হিসেবেই আমি রচনা করেছি। কেননা বাংলাভাষী জনগণের নিকট দুনিয়ার সমস্ত প্রাচীন ও আধুনিক মতাদর্শ ও জীবন-ব্যবস্থার মুকাবিলায় তুলনামূলকভাবে উন্নততর ও সর্বাধিক কল্যাণকর জীবন-বিধান দ্বীন-ইসলামকে উপস্থাপিত করা এবং তা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য আহ্‌বান জানানোই আমার জীবনের একমাত্র সংকল্প ও সাধনা। আমার সমগ্র জীবনে আমি যা কিছু লিখেছি, যত বক্তৃতা-ভাষণ দিয়েছি এবং কার্যত যা করেছি, তার সবকিছুরই অন্তর্নিহিত মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাই। বর্তমান গ্রন্থখানি সেই পর্যায়েই এক নতুন সংযোজন। আমার এযাবৎকালের যাবতীয় কাজের মধ্যে যে অসম্পূর্ণতা ছিল, এই বই খানির মাধ্যমে তা পূর্ণ হচ্ছে বলে আমি মহান আল্লাহ্ তা'আলার শোকর আদায় করছি।

মানব সমাজে নারী-পুরুষ সমস্যা যে অন্যান্য যাবতীয় সমস্যার মতই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তা কোন সমাজতত্ত্ববিদই অস্বীকার করতে পারেন না। এই সমস্যার সঠিক, নির্ভুল ও সুষ্ঠু সমাধান না হওয়া পর্যন্ত অন্যান্য কোন সমস্যারই যে নির্ভুল ও যথার্থ সমাধান সম্ভব নয়, তা আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। কিন্তু এই সমস্যার সমাধান উদ্দেশ্যে আমাদের নারী সমাজ, সমাজ সংস্কারক ও সমাজ-দার্শনিক এবং রাষ্ট্র পরিচালকগণ যে পন্থা প্রয়োগ করে আসছেন এবং যেদিকে নারী সমাজকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, আমার বিচার-বিবেচনায় তা অত্যন্ত ভ্রান্তিপূর্ণ। শুধু তাই নয়, বিশেষভাবে নারী সমাজের জন্য এবং সাধারণভাবে গোটা মানবতার জন্য তা অত্যন্ত মারাত্মক বলে আমি মনে করি। আমার ধারণা, সমাজ ও রাষ্ট্র চালকরা কথিত সমাধান দিয়ে নারী সমাজের এতটুকু কল্যাণ সাধন করছেন না; বরং তারা যে ব্যাপক ও চরম বিপর্যয়ের দিকেই সমাজকে ঠেলে দিচ্ছেন–এই কথা আমি স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই। তার পরিবর্তে বিশ্বস্রষ্টা মহান আল্লাহ্ তা'আলা যে পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান দিয়েছেন নবী-রাসূলগণের এবং সর্বশেষ নবী-রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে, যা কুরআন মজীদ ও নির্ভুল হাদীসসমূহে বিধৃত–তা-ই যে সঠিক ও নির্ভুল এবং ইহ-পরকালের দৃষ্টিতে পূর্ণ মাত্রায় কল্যাণকর, এই উদাত্ত ঘোষণাই আমি দিয়েছি এই গ্রন্থখানির মাধ্যমে। দেশের জনগণ, নারী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালকদের নিকট আমি এই সমাধান গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য আকুল আহ্‌বান জানাচ্ছি।

আমার উদ্দেশ্য কতটা সফল হয়েছে, তা পাঠকদেরই বিবেচ্য।

১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭
২০৮, নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা।

মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

সূচী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

স্বভাবসম্মত নারী জীবন

নারী অর্ধেক মানবতা। পুরুষ মানবতার মাত্র একাংশের প্রতিনিধি। অপর অংশের প্রতিনিধিত্ব করে নারী। তাই নারী সমাজকে বাদ দিয়ে মানব জাতির জন্যে যে-পরিকল্পনাই রচিত হবে, তা অনিবার্যভাবে হবে অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ। কেবল পুরুষ সমন্বয়ে গঠিত কোন মানব সমাজের–যেখানে নারীর প্রয়োজনই নেই–কল্পনাও করা যায় না। কেননা নর ও নারী পরস্পর সম্পূরক, পরস্পর নির্ভরশীল। না নারী পুরুষ ছাড়া চলতে পারে, না পুরুষ পারে নারীবিহীন হয়ে থাকতে। এই মুখাপেক্ষিতা ও নির্ভরতা সামাজিক, জৈবিক ও মনস্তাত্ত্বিক–সর্বদিক দিয়ে। সামষ্টিক জীবনের দাবি হল, নারী-পুরুষ পায়ে পা মিলিয়ে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলবে। অপর দিকে স্বভাবগত যৌন স্পৃহার চাহিদা হচ্ছে, নারী ও পুরুষ পরস্পরের নিকট থেকে শান্তি, স্বস্তি, তৃপ্তি ও সার্থকতা লাভ করবে।

বস্তুতঃ সামষ্টিক জীবনের সুষ্ঠুতা ও উন্নতি একান্তভাবে নির্ভর করে নারী-পুরুষের মাঝে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ক যথার্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যৌন সম্পর্কও যথার্থ ও পবিত্র হওয়ার ওপর। নারীর চেষ্টা-সাধনায় যে ত্রুটি ও অপূর্ণতা থেকে যাবে, পুরুষ তা কানায় কানায় পূর্ণ করে দেবে। পক্ষান্তরে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অপূর্ণতা থাকবে পুরুষের দায়িত্ব পালনে, তার পরিপূরণে এগিয়ে আসবে নারী। নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্ক তার স্বভাবসম্মত সীমার মধ্যে সীমিত থাকবে এবং নিছক স্বাদ-আস্বাদন ও লালসা চরিতার্থকরণের উপায় হিসেবেই তা গ্রহণ করা হবে না। এটাই সর্বতোভাবে যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত।

নারী-পুরুষের সামাজিক সম্পর্ক যদি ভারসাম্যহীন হয় এবং তাদের পারস্পরিক যৌন সম্পর্ক উচ্ছৃঙ্খলতায় আকীর্ণ হয়ে উঠে, তাহলে গোটা মানব সমাজই সর্বাত্মক ভাঙন ও বিপর্যয়ের মুখে এসে দাঁড়াবে। কেননা, এই ভারসাম্যহীনতার পরিণামে সামষ্টিক জীবনের অনেকগুলো দিক শূন্য থেকে যাবে আর অনেকগুলো দিকের ওপর অস্বাভাবিক ও অপ্রয়োজনীয় গুরুত্ব আরোপিত হবে। এই দুটো অবস্থাই সুষ্ঠু সমাজ জীবনের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক। অনুরূপভাবে যৌন সম্পর্ক শৃঙ্খলাহীন হয়ে গেলে সমাজ-সংস্থা ভাঙন ও বিপর্যয়ের শিকার হবে অথবা যৌন সম্পর্ক সম্পূর্ণ পরিহার করার প্রবণতা সমাজে সাধারণভাবে প্রবল হয়ে দেখা দিবে। যে-সব জাতির জীবনে, যৌন-উচ্ছৃঙ্খলতা

ব্যাপক ও মারাত্মক হয়ে দেখা দেয়, সে সব জাতি বেশী দিন পৃথিবীর বুকে টিকে থাকতে পারে না। পক্ষান্তরে যৌন-বিমুখতা মানব সভ্যতা গড়ে তোলার পথে বিরাট অন্তরায়। মানুষের ইতিহাস এ কথার যথার্থতা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে।

আধুনিক সভ্যতা নারী ও পুরুষের মাঝে স্বভাবসম্মত সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। আর যৌন সমস্যার সমাধান করা তো তার সাধ্যেরও অতীত। কেননা আধুনিক সভ্যতা নারীর জন্যে তার আসল ও স্বভাবসম্মত স্থান নির্ধারণ করতে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে; বরং তার আসল ও স্বভাবসম্মত স্থান থেকে টেনে নিয়ে তাকে পুরুষদের কাতারে দাঁড় করিয়ে দিয়ে এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি করেছে। ফলে নারী আজ পুরুষদের জন্যে নির্দিষ্ট বিশাল কর্মক্ষেত্রে সদা কর্মতৎপর; অথচ তার সৃষ্টি হয়েছে যে কাজের জন্যে, সেখানে সে অনুপস্থিত। আধুনিক সভ্যতা যৌন ভাবাবেগকে এতটা প্রবল, সুতীব্র ও উচ্ছ্বসিত করে তুলেছে যে, মানুষের মন ও মগজের ওপর তার সর্বাত্মক আধিপত্য সংস্থাপিত হয়ে গেছে। ফলে মানুষ আসল করণীয় বিষয়কে উপেক্ষা করে চলেছে এবং চারদিকে যৌন স্বাদ-আস্বাদনের এক প্রচন্ড বন্যা বইছে।

এ কথায় কোনই সন্দেহ নেই যে, নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ ভুল ও ভ্রান্ত কাঠামোর উপর গড়ে উঠেছে বলে বর্তমান সভ্যতা এক কঠিন বিপর্যয়ের সম্মুখীন। এক্ষণে মানুষ এমন এক স্থানে দাঁড়িয়ে, যেখানে শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তার অশেষ উপায়-উপকরণ থাকা সত্ত্বেও মানুষ তা থেকে বঞ্চিত। তার এ বঞ্চনা কিছুমাত্র ঘুচবে, তা-ও সুদূরপরাহত বলে মনে হয়।

আধুনিক সভ্যতা ও সামাজিক অবস্থা যাঁরা অনাবিল, অনাসক্ত ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার-বিবেচনা করছেন, তাঁরা আমাদের উপরোক্ত কথার সত্যতা অবশ্যই স্বীকার করবেন। এ কথায়ও তাঁদের কোন সন্দেহ থাকবে না যে, সামান্য ও নগণ্য ধরনের সংশোধন চেষ্টা-প্রচেষ্টা দ্বারা এই সমাজকে রক্ষা করা যাবে না তাকে নিরোগ ও সমস্যামুক্ত করাও এ উপায়ে সম্ভব হবে না। এক্ষনে নারী ও পুরুষ সমন্বয়ে সুষ্ঠু সমাজ-সংস্থা গড়ে তোলার জন্যে সম্পূর্ণ নতুনভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা একান্তই অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। সেজন্যে বর্তমান ঘুণে-ধরা সমাজ কাঠামোকে ভেঙ্গে ফেলে তাকে নতুনভাবে সুদৃঢ় করে সংস্থাপন করতে হবে। এই প্রেক্ষিতেই আমরা অত্র আলোচনার অবতারণা করছি।

আমাদের বিশ্বাস, ইসলামী আদর্শই নারী-পুরুষের সামাজিক ও যৌন জীবনের জন্যে নির্ভুল ভিত্তি উপস্থাপন করেছে। এই ভিত্তির উপর যে সম্পর্ক কাঠামো গড়ে উঠবে, তা সর্ব প্রকার ভাঙন, বিপর্যয় ও উচ্ছৃংখলতার আবিলতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থেকে সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হবে। পাশ্চাত্য সভ্যতার

সংস্থাপিত কাঠামো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে নবতর সমাজ-কাঠামো গড়ে তোলা ছাড়া আধুনিক মানুষের জন্যে অন্য কোন উপায় নেই। একথা আমরা বলিষ্ঠ কণ্ঠেই বলতে চাই।

এ পর্যায়ে এখানে আমরা যে আলোচনার অবতারণা করছি, তাকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি। প্রথম ভাগে আমরা দেখাব, নারী সম্পর্কে পাশ্চাত্য মনীষীদের আধুনিক চিন্তাধারা ও মতাদর্শ এবং দ্বিতীয় ভাগে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো, ইসলাম নারীকে কি মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে এবং স্বভাবসম্মত নারী-জীবনের জন্য কি পরিকল্পনা উপস্থাপন করেছে।

জুলুমের পরিণাম কখনই ভাল হয় না। নারী সুদীর্ঘকাল থেকে নানাভাবে নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত। এ অবস্থা যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেল, তখনই তার ভয়াবহ পরিণতির প্রকাশ ঘটতে শুরু করল। পশ্চাত্যে শিল্প বিপ্লবের পর জীবনের প্রায় সব কয়টি ক্ষেত্রেই বিপ্লব এসেছে। ফলে নারীর সামাজিক মর্যাদাও পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এই সে দিনও নারীকে অত্যন্ত হীন ও নীচু মনে করা হত কিন্তু আজ সেই নারীই ইজ্জত ও সম্মানের দাবিদার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতীতে এমন একটা সময় ছিল, যখন পুরুষ নারীকে তার যথার্থ ও ন্যায্য মর্যাদা দিতেও প্রস্তুত ছিল না। ফলে সে যখন সুযোগ পেয়ে গেল, তখন স্বীয় মর্যাদা ও অধিকার আদায় করতে গিয়ে তার স্বাভাবিক সীমা লংঘন করে সমুখের দিকে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেল। তার সীমালংঘনমূলক সে অগ্রগতি আজও চলছে; মুহূর্তের তরেও তা থেমে যায় নি। অতীতে নারী-জীবনে এমন একটা সময় এসেছিল, যখন সে তার ঘরের ক্ষুদ্রায়তন পরিবেষ্টনীর মধ্যেও কিছুমাত্র স্বাধীন ছিল না। কিন্তু আজ অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। আজকের নারীকে রুখতে পারে, এমন শক্তি না ঘরের ভিতরে আছে, না ঘরের বাইরে।

আজকের পাশ্চাত্য নারী স্বাধীনতার সুউচ্চ পর্যায়ে উপনীত। ঐতিহাসিক কার্যকারণ এই ব্যাপারে তার পক্ষে খুব বেশী সহায়ক হয়েছে। ঠিক যে সময় নারীরা পুরুষের নির্যাতন-নিষ্পেষণের অক্টোপাশ থেকে মুক্তি লাভের জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টারত, ঠিক সে সময়ই পাশ্চাত্যে শিল্প-বিপ্লবের সূচনা ঘটে। এই বিপ্লবই নারীর মুক্তি সংগ্রামকে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়ে দেয়। পূর্বে যে ঘর ছিল তার কর্মক্ষেত্র, তার বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে চেয়েছিল; কিন্তু ঘরের বাইরে সে কোথায় যাবে, কি করবে, জীবনের কোন্ নীল-নক্শাকে সে অবলম্বন করবে, সে বিষয়ে তার কিছুই জানা ছিল না। কিন্তু শিল্প-বিপ্লব তাকে শুধু পথ নয়–উদার, উন্মুক্ত ও লোভনীয় রাজপথ দেখিয়ে দিল। এই বিপ্লব নারীর সম্মুখে জীবনের যে নীল-নক্শা উজ্জ্বল ও স্পষ্ট করে তুলে ধরল, তা ঘরোয়া জীবন থেকে অনেক লোভনীয় ও আকর্ষণীয় বলে প্রতীয়মান হল। তার এ কথা বুঝে নিতে দেরী হল না যে, সে এই নীল-নক্শা অবলম্বন করে গোলামীর জিঞ্জিরকে ছিন্ন করতে পারে। নারী তার পিতা-মাতা ও স্বামীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবে বলে অতীতে কখনও কল্পনাও করা যায় নি। কিন্তু এই নীল-নক্শাই তাকে বিদ্রোহ ঘোষণায় উদ্বুদ্ধ করল। কেননা, এক্ষণে সে কারুরই মুখাপেক্ষী থাকল

না–থাকল না কারুর ওপর নির্ভরশীল। তার প্রয়োজন পূরণ ও লালসার ইন্ধন যোগানোর বিপুল আয়োজন-সমারোহ চতুর্দিকে স্তূপীকৃত। সুযোগ-সুবিধার সমস্ত দুয়ার তার সম্মুখে উন্মুক্ত–অবারিত। তাই খুব সহজেই সে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারল।

নারী সমাজের এই বিদ্রোহের মূলে নিজেদের অবস্থার সংশোধন ও উন্নয়ন ইচ্ছা যতটা কার্যকর ছিল, তার চাইতে অধিক প্রভাবশালী ছিল পুরুষদের বন্ধন থেকে মুক্তি এবং প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা। এই কারণে যে সমাজ-ব্যবস্থা তাদেরকে পুরুষদের অধীন করে রেখেছিল, তার শৃঙ্খলকে তারা সর্বপ্রথম ছিন্ন করল। অথচ প্রকৃতপক্ষে এই ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যানযোগ্য ছিল না। তাতে কিছু কিছু দোষ-ত্রুটির অনুপ্রবেশ অবশ্যই ঘটেছিলঃ কিন্তু তা সত্ত্বেও তাতে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যেই অশেষ কল্যাণ নিহিত ছিল। তাই এই ব্যবস্থা চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ার নয়, সংশোধন হওয়ার যোগ্য ছিল। কিন্তু কোন বিশেষ ব্যবস্থা ও আদর্শের বিরুদ্ধে একবার কোনরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলে তা চরম পরিণতি না দেখিয়ে ছাড়ে না, এ এক স্বতঃসিদ্ধ কথা। তাই দেখতে পাই, পুরুষদের অত্যাচার-নির্যাতনের বিরুদ্ধে নারীমনে যে ক্রোধ-হিংসা ও বিদ্বেষ-বহ্নি জেগে উঠেছিল, তার পরিণতিতে নারীমুক্তি আন্দোলন তার স্বাভাবিক সীমাকেও অতিক্রম করে গেল। তা নারীকে এমন এক স্থানে পৌঁছে দিল, যেখানে নারী ঠিক নারী থাকতে পারল না; সে হয়ে গেল অনেকাংশে পুরুষের প্রতিরূপ। কিন্তু নারীর পুরুষরূপ কোনক্রমেই বাস্তব হতে পারে না–তা নিতান্তই কৃত্রিম ও অন্তঃসারশূন্য। কেননা প্রকৃতপক্ষে নারীর পুরুষ হয়ে যাওয়া কক্ষণই সম্ভবপর হতে পারে না। পুরুষও কখনও পারে না নারী হয়ে যেতে। উভয়েই সম্পূর্ণ পরস্পর-বিরোধী দেহাবয়ব, আকার-আকৃতি ও শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। একই স্থান ও কাল, একই আবহাওয়া ও পরিবেশ ও একই পিতামাতার সন্তান হয়ে এবং একই ঘরে লালিত-পালিত হওয়া সত্ত্বেও নারী ও পুরুষ স্বভাব-প্রকৃতি ও মনস্তাত্ত্বিকতার দিক দিয়ে সম্পূর্ণ পৃথক ও ভিন্ন ভিন্ন সত্তার অধিকারী। এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য এতই বেশী যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের একই প্রজাতীয় দুই ব্যক্তির মধ্যেও অতটা পার্থক্য হতে পারে না, যতটা এ দুয়ের মাঝে বিদ্যমান। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বর্ণ, বংশ, আবহাওয়া, পরিবেশ, ভৌগলিক অবস্থান ও ভাষার পার্থক্য কিছুমাত্র মৌলিক গুরুত্বের অধিকারী নয়। কেননা, সেক্স বা লিঙ্গের পার্থক্য অতীব মৌলিক–অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতালব্ধ অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে যে, লিঙ্গের পার্থক্য খুব নগণ্য বা সামান্য ব্যাপার নয়। শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ ও পরিবেশের প্রভাব দ্বারা এই পার্থক্য অতিক্রম করা কখনই সম্ভবপর হতে পারে না। কেননা মানব-সত্তায় জন্মগতভাবেই যে

যোগ্যতা বিদ্যমান, মানুষ কেবল তারই লালন ও বিকাশ সাধন করতে পারে। যে শক্তি বা যোগ্যতা আসলেই তার মধ্যে নেই, তার উন্নতি বা বিকাশ সাধনের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। নারী বা পুরুষ শিক্ষণ–প্রশিক্ষণ ও চেষ্টা-সাধনার সাহায্যে খোদাপ্রদত্ত শক্তি ও যোগ্যতারই প্রবৃদ্ধি সাধন করতে পারে, নবতর কোন যোগ্যতা মৌলিকভাবে ও নতুন করে সৃষ্টি করার সাধ্য কারুর নেই।

মানব জাতির গোটা ইতিহাস থেকেই এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। আজ পর্যন্ত লব্ধ কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই এই কথাকে অসত্য প্রমাণ করতে পারেনি। Man the unknown নামক গ্রন্থের গ্রন্থকার নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত প্রখ্যাত ফরাসী চিন্তাবিদ আলেক্সিস ক্যারেল লিখেছেনঃ

> পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায়, তা মৌলিক পর্যায়ের। তাদের দেহের রগ-রেশা-স্নায়ু সংগঠন ভিন্নতর বলেই তাদের মধ্যকার এ পার্থক্য। নারীর ডিম্বকোষ থেকে যে রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত হয়, তার প্রভাব নারীদেহের প্রতিটি অঙ্গে প্রতিফলিত হয়। নারী-পুরুষের স্বভাবগত ও মনস্তাত্ত্বিক বিভিন্নতার কারণও এটাই।

বস্তুতঃ নারী ও পুরুষ কেবলমাত্র দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, আকার-আকৃতি, অস্থি-মজ্জা, গঠন-প্রকৃতি ও স্নায়ু সংগঠনের দিক দিয়েই ভিন্ন নয়, এদিক দিয়েও তারা ভিন্নতর যে, তারা সমান পরিমাণের বায়ু ও খাদ্য গ্রহণ করে না। তাদের রোগ-ব্যাধিও হয় বিভিন্ন রকমের, বিভিন্ন রূপের ও বিভিন্ন প্রকৃতির। তাদের মানসিক ঝোঁক-প্রবণতা ও নৈতিকবোধও একই রকমের নয়। এক্ষেত্রে পুরাপুরি বৈচিত্র অবশ্যই লক্ষ্যণীয়।

আজ থেকে প্রায় এক শতাব্দীকাল পূর্বে যখন নারী-স্বাধীনতার আন্দোলন এতটা ব্যাপকতা লাভ করেনি, তখনও এই ধরনের মত ও চিন্তাধারা বিদগ্ধ মহলে প্রকাশ করা হয়েছিল। ঊনবিংশ শতকের বিশ্বকোষে লিখিত হয়েছিলঃ

> পুরুষ ও নারীর যৌন-অঙ্গের সংগঠন ও আকৃতির বিভিন্নতা যদিও খুব বড় বিভিন্নতা বলেই মনে হয়; কিন্তু এ দু'য়ের মধ্যে বিভিন্নতা কেবল এ দিক দিয়েই নয়; নারীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত সব কটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই পুরুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে অনেকটা ভিন্নতর। এমনকি, যে সব অঙ্গ বাহ্যতঃ পুরুষদের সদৃশ মনে হয়, তা-ও।

নারী ও পুরুষের মধ্যকার এই জন্মগত ও স্বভাবগত পার্থক্যের কারণে প্রত্যেকের কাছ থেকে তার শক্তি, সামর্থ্য ও কর্ম-ক্ষমতা অনুপাতেই কাজ গ্রহণ করা এবং তাকে সেই ধরনের কাজে নিযুক্ত করাই স্বাভাবিকতার দাবি। জীবনের অনেকগুলো ক্ষেত্রে ঠিক তা-ই করা হচ্ছে আবহমান কাল থেকে। সাধারণতঃ

কোন প্রকৌশলীকে কৃষি কাজে নিযুক্ত করা হয় না। শিক্ষা-বিশেষজ্ঞকে লাগানো হয় না জাহাজ নির্মাণের কাজে। একই লিঙ্গের দুই ব্যক্তির মধ্যে যোগ্যতা-প্রতিভা, ঝোঁক-প্রবণতা, রুচিশীলতা ও আনুপাতিকতার দৃষ্টিতে অবশ্যই পার্থক্য করা হয়। এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, নারী ও পুরুষের মাঝেও এইরূপ মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। মানুষ হিসেবে তারা অভিন্ন; কিন্তু উভয়ের দৈহিক ও আঙ্গিক সংগঠন, মনস্তত্ব ও মানসিকতা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাদের ওপর আবর্তিত বিভিন্ন অবস্থায় উভয়ের প্রতিক্রিয়া, আবেগ-উচ্ছ্বাস ও অনুভূতি সম্পূর্ণভাবে পরস্পর বিভিন্ন। এ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, উভয়ের সৃষ্টিই হয়েছে আলাদা ধরনের প্রকৃতিতে ও সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্যে। প্রকৃতি উভয়ের দ্বারা একই ধরনের ও একই রকমের কাজ নিতে ইচ্ছুক নয়; সে চায় ভিন্ন ভিন্ন কাজ নিতে। তার আঙ্গিক ও মনস্তাত্বিক বিভিন্নতার মূলে এই কারণটিই তীব্রভাবে নিহিত।

কিন্তু আধুনিক কালের নব্য চিন্তা ও দৃষ্টিকোণ নারী-পুরুষকে একই ক্ষেত্রে টেনে এনেছে এবং উভয়কে ঠিক পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আর একই ক্ষেত্রে উন্নতি-অগ্রগতি লাভের সুযোগ-সুবিধাও উভয়কে একই রকমেরই দেয়া হচ্ছে। নারী ও পুরুষের যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা যে এক ও অভিন্ন নয়, সে কথা একবারও চিন্তা ও বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে না। অথচ এ পর্যায়ে পেশ করার মত স্বভাবগত ও মনস্তাত্বিক কোন প্রমাণই তাদের হাতে নেই। যে সব কাজ পুরুষরা করতে পারে, সেই সব কাজ যে মেয়েরাও সাধারণত করতে পারে, এমন অকাট্য প্রমাণ আজ পর্যন্ত পেশ করা সম্ভবপর হয়নি।

আলেক্সিজ ক্যারেল পুরুষ ও নারীর মধ্যকার স্বভাবগত ও মনস্তাত্বিক পার্থক্য ও বিভিন্নতা পর্যায়ে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেনঃ

> নারী ও পুরুষের মধ্যকার স্বভাবগত পার্থক্য প্রমাণকারী মৌলিক সত্যকে উপেক্ষা করার কারণে নারী-স্বাধীনতার আন্দোলনকারীরা দাবি করেছে যে, নারী ও পুরুষের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্পূর্ণভাবে অভিন্ন ও সমান হতে হবে। অথচ প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, এই দুয়ের মধ্যে সীমাহীন পার্থক্য বিদ্যমান। নারীদেহের প্রতিটি কোষের উপর তার নারীত্বের চিহ্ন অঙ্কিত রয়েছে। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কেও এ কথাই সত্য−বিশেষ করে তার স্নায়ুমণ্ডলী সম্পর্কে। নারীদের কর্তব্য তাদের স্বভাব-প্রকৃতি অনুযায়ী নিজেদের ঝোঁক-প্রবণতার রূপায়ণ। পুরুষদের অনুকরণ করা তাদের উচিত নয়। সভ্যতার বিকাশ ও অগ্রগতিতে নারীদের তুলনায় পুরুষদের অবদান অনেক বেশী। এ কারণে তাদের নিজেদের বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহের ব্যাপারে কোনরূপ উন্নাসিকতা প্রকাশ সম্পূর্ণরূপে অনুচিত।

বস্তুতঃ নারী-পুরুষের মধ্যকার স্বভাবগত ও জন্মগত পার্থক্য ও বিভিন্নতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই তাদের সামাজিক অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করা কর্তব্য। উভয়ের মধ্যে স্বভাবগত পার্থক্য আধুনিক পাশ্চাত্য মিথ্যা প্রমাণ করতে পারেনি; পারেনি এ পার্থক্যকে দূর করে উভয়কে সর্বতোভাবে একাকার ও অভিন্ন করে তুলতে। ফলে নারী-পুরুষের সাম্যের যে দাবি আধুনিক পাশ্চাত্য থেকে জোরদার হয়ে উঠেছে, তা সর্বৈব মিথ্যা ও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে। সেখানে মনে করা হয়েছে যে, এরূপ করতে পারলেই নারীদের করুণ ও মর্মান্তিক অবস্থা দূর করা ও তা থেকে তাদের মুক্তিসাধন সম্ভবপর হবে। মনে করা হয়েছে যে, সমাজে পুরুষদের প্রাধান্য রয়েছে বলেই নারী উপেক্ষিত, পদদলিত। নারী সমাজ নিজেদের জান-মাল সংরক্ষণের সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার থেকেও এ কারণেই বঞ্চিত। এ কারণে পাশ্চাত্যের মতে নারীদেরও পুরুষদের মতই অধিকার দিতে হবে। উপরন্তু সমাজে কেবল পুরুষদেরই প্রাধান্য দেয়া চলবে না। এই প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব যে সব কারণ ও উপায়-উপকরণের দরূণ অর্জিত হয়ে থাকে, তা বিশেষ এক লিঙ্গের লোকদের জন্যে নির্দিষ্ট করে না দিয়ে উভয়ের জন্যে তার দ্বার সমানভাবে উন্মুক্ত করে দিতে হবে। নারীদেরও সমাজ ও রাষ্ট্রের উচ্চতর পদে নিয়োগ করতে হবে। তা নাহলে এক লিঙ্গের লোকেরাই সর্বত্র অগ্রগতি লাভ করবে এবং অপর লিঙ্গের লোকেরা থাকবে পশ্চাদপদ হয়ে। তার ফলে গোটা সমাজ ভারসাম্যপূর্ণ উন্নতি লাভ করতে পারবে না। কেননা সমাজের যে অংশ বা শ্রেণী অনুন্নত ও পশ্চাদপদ থেকে যাবে, তারা অপর অংশ বা শ্রেণী কর্তৃক শোষিত ও নিষ্পেষিত হবে। ক্ষমতাশালী লোকেরাই যে জুলুম করে এবং তাদের সে জুলুম প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কারুর থাকে না, এতো সর্ববাদী সম্মত কথা!

এ হল নারী ও পুরুষের সামাজিক অধিকার ও দায়িত্বকে অভিন্ন মনে করার দৃষ্টিকোণ। অথচ প্রকৃতপক্ষে এ দুটি শ্রেনী অভিন্ন নয়। এ দুয়ের মাঝে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। কারুর প্রতি সুবিচার, ন্যায়পরতা ও সাম্যের আচরণ গ্রহণ এক কথা আর তাকে কোন নির্দিষ্ট সামাজিক কাজে নিয়োগ করা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। এই দুটি বিষয়কে এক ও অভিন্ন মনে করা একটা মারাত্মক ধরনের ভুল। কেননা তার ফল এই দাঁড়াবে যে, কেউ কোন বিশেষ ধরনের কাজ করতে অক্ষম হলে তাকে সামাজিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত হতে হবে।

নারীদের ওপর জুলুম ও অবিচার সংঘটিত হয়ে থাকলে এবং তারা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকলে মনে করতে হবে, রাষ্ট্র ও সমাজ তার কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে অক্ষম রয়েছে বলেই এমন হয়েছে। নাগরিকদের, বিশেষত নারীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক সুযোগ-সুবিধাগুলো তাদের জন্য সহজলভ্য করে দেয়া তো রাষ্ট্রেরই কর্তব্য। যে রাষ্ট্র তার এই কর্তব্য

পালন করে না, তার অস্তিত্ব জনগণের জন্যে একেবারেই অর্থহীন। বিশেষ কোন নাগরিককে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা বা বঞ্চিত থাকতে দেয়ার কোন অধিকারই থাকতে পারে না কোন রাষ্ট্রের। সেই সঙ্গে জনগণের বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর প্রতি বিভেদমূলক আচরণ গ্রহণ করাও কোন রাষ্ট্রের পক্ষে শোভন হতে পারে না। কোন রাষ্ট্রে সেরূপ হতে থাকলে সে রাষ্ট্রের অস্তিত্বকেই ধ্বংস করে দেয়া উচিত। কেননা এটা একটা গুরুতর অপরাধ, তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

কিন্তু কোন রাষ্ট্রের নাগরিক হলেই যে তাকে নির্বিশেষে সর্বপ্রকারের দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত করতে হবে, এমন কোন কথা হতে পারেনা। কেননা দায়িত্ব পালনের জন্যে প্রয়োজন যোগ্যতার। আর সবরকমের লোকেরই যে সব রকমের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা থাকবে, এমন কথা যুক্তিসঙ্গত নয়। কাজেই নারীদের যে সব কাজ করার সত্যিই যোগ্যতা আছে, তাদের কেবল সেই সব কাজের দায়িত্বই দেয়া উচিত। যে সব কাজের যোগ্যতা স্বভাবতঃই তাদের নেই, সেই সব কাজের বোঝা তাদের ওপর চাপিয়ে দিলে তার মত জুলুম ও অমানুষিক কাজ আর কিছু হতে পারে না।

পাশ্চাত্য ভাবধারাপূর্ণ আধুনিক সমাজ এই যুক্তিপূর্ণ কথাটিকেই উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করে চলেছে। এসমাজের লোকেরা কয়েক ধরনের বিশেষ কাজ তথা পেশা ও শিল্পকেই উন্নতি, অগ্রগতি ও সম্মানের প্রতীক মনে করে নিয়েছে। বস্তুত মান-সম্মান ও অপমান-লাঞ্ছনার এ এক মনগড়া মানদণ্ড। এই মানদণ্ড রচনা করা হয়েছে পুরুষদের যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতাকে সামনে রেখে। নারীদের মেজাজ প্রকৃতি অনুসারে এই মানদণ্ড রচিত হয়নি। তা সত্ত্বেও এই মানদণ্ডের ভিত্তিতেই নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করার জন্যে নারীদের প্রতি আহবান জানানো হয়েছে। এটা যে কত বড় অবিচার, তা বলে শেষ করা যায় না। বস্তুত প্রকৃতি যার মধ্যে যে যোগ্যতা রেখেছে, সে ধরনের কাজকেই তার সাফল্যের মানদণ্ড রূপে নির্ধারণ করা বাঞ্ছনীয়। কেবল তা হলেই প্রত্যেক লিঙ্গের লোকেরা নির্দিষ্ট মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে পারে। মেয়েদের স্বাভাবিক যোগ্যতার মানদণ্ডে পুরুষদের উন্নীত হতে বলা যেমন হাস্যকর, এ-ও তেমনি। এরূপ হলে প্রত্যেককেই আপন স্বভাব-প্রকৃতির সাথে দ্বান্দ্বিক ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। আর স্বভাব-প্রকৃতির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার মত মারাত্মক ব্যাপার কল্পনাও করা যায় না।

বলা হয়, বর্তমানে নারীর যা প্রকৃতি—তা কৃত্রিম; তা তার আসল প্রকৃতি নয়। পুরুষদের ক্রমাগত ও দীর্ঘকালীন নিপীড়ন ও শোষণ-নির্যাতনের শিকার হতে থাকার ফলেই নাকি বর্তমানে নারী-প্রকৃতি পুরুষদের তুলনায় দুর্বল হয়ে পড়েছে। তার চিন্তা-চেতনা ও কর্মশক্তি অনুন্নত ও অনগ্রসর হয়ে রয়েছে দীর্ঘদিন পর্যন্ত।

তাকে আপন মেধা-প্রতিভার চর্চা ও লালন করার সুযোগ দেয়া হয়নি বলেই তার এই অবস্থা। যদি তা না হত, পুরুষের ন্যায় সুযোগ-সুবিধা যদি তারাও লাভ করতে পারত, তাহলে আজ তাদের স্বভাব-প্রকৃতি নাকি পুরুষদের মতই হত এমনকি তারা স্বাভাবিক যোগ্যতা, প্রতিভা ও কর্মক্ষমতার দিক দিয়ে নাকি পুরুষদেরও ছাড়িয়ে যেতে পারত।

কিন্তু যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে এই দাবি মোটেই ধোপে টেকেনা। স্বাধীনতা ও সুযোগ-সুবিধা পেলে নারী সর্ব দিক দিয়ে পুরুষদের সমান হতে পারত-এ সম্ভাবনা মেনে নিলে, সেরূপ না হতে পারার সম্ভাবনাকেও স্বীকার করতে হবে। কেননা এ দুটি সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে সমান মাত্রার। এ দৃষ্টিতে বলা যায়, নারীদের মধ্যেও পুরুষালী দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা রয়েছে বলে যে দাবি করা হয়, তার কোন ভিত্তি নেই। বিশেষতঃ নারীর বর্তমান মনস্তত্ব ও যোগ্যতা-কর্মক্ষমতাই অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, জীবন-সংগ্রামে তার ক্ষেত্র পুরুষদের ক্ষেত্র থেকে সর্বতোভাবে ভিন্নতর। আর পুরুষদের স্বভাবগত যোগ্যতা, কর্মক্ষমতাও নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, তাদের কর্মক্ষেত্র নারীদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হওয়া একান্তই আবশ্যক।

পুরুষদের অবিচার ও নিষ্পেষণই নারীকে তার অন্তর্নিহিত প্রতিভা ও যোগ্যতার বিকাশ ও প্রকাশ সাধন করতে দেয়নি এবং তার পথে প্রবল প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে বলে যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে, তাও বহুলাংশে বাস্তবতার পরিপন্থী। সামাজিক মনস্তত্ত্ববিদগণ স্পষ্ট কণ্ঠে বলেছেন, ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে নারী অবাধ ও উদার সুযোগ-সুবিধা পেয়েও নিজের বিশেষ কর্মক্ষেত্রের বাইরে উল্লেখযোগ্য কোন কীর্তি স্থাপন করতে পারেনি। নারীর উপর অনেক সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব অর্পিত হওয়া সত্ত্বেও সে তা স্বাধীনভাবে পালন করতে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। বস্তুত নারী স্বভাবতঃই অন্যের সহানুভূতি পাওয়ার জন্য উদগ্র হয়ে থাকে। তার মধ্যে স্বাধীনতা ও স্ব-নির্ভরতার বাসনা ও প্রেরণা পুরুষদের ন্যায় প্রবল নয়। এ কোন মনগড়া বা বিদ্বেষমূলক কথা নয়; এ সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক সত্য। মানবেতিহাসে এমন কোন কীর্তিময়ী নারীর নাম পাওয়া যায় না, যে পুরুষদের সাথে নিঃসম্পর্ক হয়ে স্বতন্ত্র ও নিজস্বভাবে মানবজাতির জন্যে কোন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। মাদাম কুরি তাঁর স্বামী মিঃ কুরির সঙ্গে থেকে বিজ্ঞানে, মিসেস ব্রাউনিং তাঁর জীবন সঙ্গী মিঃ ব্রাউনিং-এর সঙ্গে থেকে কাব্যে এবং জর্জ ইলিয়ট মিঃ লিউসের সঙ্গে থেকে উপন্যাস রচনায় যে অবদান রেখেছেন, তা নিতান্তই সহযোগিতা-নির্ভর এবং এ সহযোগিতা এসেছে পুরুষদের নিকট থেকে। ইতিহাসে একটা

কালস্রোত এমনও অতিবাহিত হয়েছে, যখন নারী পুরুষেরই সমান চেষ্টা-সাধনার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করেছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রকৃতি নারী ও পুরুষের মাঝে যে পার্থক্য রেখেছে, তা সম্পূর্ণ অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে।[১] এ কালেও এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বহু আলোক-বঞ্চিত সমাজে নারীরা বিশেষ কোন ক্ষেত্রে বন্দী হয়ে না থেকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সরাসরি পদক্ষেপ গ্রহণের চেষ্টা করা সত্ত্বেও পুরুষদের সমান যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। বলা বাহুল্য, কোনদিন তা হতেও পারবে না।

বর্তমান সভ্য যুগটার কথাই একবার বিচার করা যাক। এ যুগে নারীরা পুরুষদের সমান স্বাধীনতা ও সুযোগ-সুবিধা—অন্ততঃ পাশ্চাত্য দেশসমূহে পেয়েছে বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু এই স্বাধীনতা ও সুযোগ-সুবিধা কি নারীদের দৈহিক সংগঠন ও প্রকৃতিতে কোন মৌলিক পরিবর্তন এনে দিতে পেরেছে? শারীরবৃত্ত (Physiology) অনুসারে নারী ও পুরুষের দৈহিক ও মগজ সংস্থানের মধ্যে বিরাট ব্যবধান। এই ব্যবধান যেমন প্যারিসের মত একটা সাংস্কৃতিক লীলাকেন্দ্রের অধিবাসীদের মধ্যে প্রকট, তেমনি প্রকট আমেরিকার জংলী অসভ্য জাতিগুলোর মধ্যেও; বরং সভ্যতা ও সংস্কৃতির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই স্বভাবগত পার্থক্যও তীব্র হয়ে উঠে। শ্বেতাঙ্গ নারী-পুরুষের মধ্যে যেমন এই পার্থক্য, তেমনি কৃষ্ণাঙ্গ নারী-পুরুষের মধ্যেও এই পার্থক্য নিঃসন্দেহে লক্ষ্যণীয়।

নারীকে যদি সামাজিক ও সামষ্টিক-সাংস্কৃতিক কাজ-কর্ম থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়, তাহলে সভ্যতা ও সংস্কৃতির গতি স্তিমিত হয়ে যাবে বলে আশংকা প্রকাশ করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রয়াস-প্রচেষ্টার সাহায্যে সভ্যতা-সংস্কৃতির যে-সব পর্যায় মাত্র পঞ্চাশ বছরে অতিক্রম করা সম্ভব, নারীদের বাদ দেয়া হলে সে সব পর্যায় একশ বছরেও অতিক্রম করা সম্ভব হবে না। এ কথার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, নারী তার স্বভাবগত কার্যাবলীতে ব্যস্ত থেকে যেন সভ্যতা-সংস্কৃতির কোন কল্যাণই সাধন করছে না। কিন্তু এ কথার কোন অকাট্য বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই। কেননা সমাজ কোন প্রকৌশলগত প্রতিষ্ঠান নয়। বিশেষ এক ধরনের কাজে সকলে মিলে আত্মনিয়োগ না করলে সমাজের কোন উন্নতিই হবে না—এমন কথা কেবল অর্বাচীনরাই বলতে পারে। মানব জীবনের বিভিন্ন বিভাগের ভারসাম্যপূর্ণ সংযোজন ও সমন্বয়েরই নাম সমাজ। এ সমাজেরই বহু

১. আজকের পাশ্চাত্য জগতের দিকে তাকালেও এর অকাট্য প্রমাণ চোখে পড়বে। সেখানে শিক্ষাদীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাষ্ট্র-প্রশাসন ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই নারীর অবাধ পদচারণা; কিন্তু পুরুষের তুলনায় তার সাফল্য মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উভয় ধরনের সমাজের বেলায়ই একথা প্রযোজ্য। —সম্পাদক

সংখ্যক বিভাগের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট বিভাগে ও বহু সংখ্যক ক্ষেত্রের মধ্যে বিশেষ একটি ক্ষেত্রে তৎপর রয়েছে আমাদের নারীকুল। এ ক্ষেত্রটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, এ ক্ষেত্র সে ত্যাগ করে চলে গেলে গোটা সমাজ-প্রাসাদই সহসা ধ্বসে পড়বে।

সামাজিক উন্নতি ঘটে সমাজের সব কটি বিভাগের ভারসাম্যপূর্ণ ও সমন্বিত উন্নতি লাভে। চিকিৎসক ও প্রকৌশলীরা উন্নতি লাভ করে তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে পেশাগত আনুকূল্য সৃষ্টিতে। শ্রমিকদের উন্নতি ঘটে শ্রমকাজের সুযোগ-সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভে। একইভাবে সাংবাদিকদের সাংবাদিকতার স্বাধীনতা ও ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ে মুনাফা লাভে যেমন সামাজিক উন্নতি নিহিত, তেমনি নারীকে তার নিজস্ব ক্ষেত্র ও পরিবেষ্টনীতে সুযোগ-সুবিধা, অধিকার ও মর্যাদা দেয়া হলেই তাদের উন্নতি লাভ সম্ভব। আর কেবল তখনই সামষ্টিক মান হতে পারে সমুন্নত।

সমাজের উন্নতির দোহাই দিয়ে শিল্প শ্রমিকদের চাষাবাদের কাজে, সাংবাদিকদের শিক্ষকতার পেশায় এবং ব্যবসায়ীদের প্রশাসন যন্ত্র চালাবার কাজে লাগান হলে যেমন কোন অগ্রগতির আশা করা যায় না, অনুরূপভাবে নারীকে পুরুষের কাজে নিয়োজিত করা হলেও আশা করা যায় না কিছুমাত্র কল্যাণের। তেমন করা হলে তাকে বুদ্ধিমানের কাজ বলবে, এমন নির্বোধ এই পৃথিবীতে কেউ আছে বলে মনে করার এখনও কোন কারণ ঘটেনি।

পেশা পরিবর্তনের স্বাধীনতা অবশ্য সকলেরই থাকতে পারে। এক পেশার লোক সেই পেশা ত্যাগ করে অন্য কোন কাজে লাগলে সে নিশ্চয়ই এমন কাজে লাগবে, যা করার তার প্রকৃতই যোগ্যতা রয়েছে। যে কাজ করার ক্ষমতা বা যোগ্যতা আসলেই নেই, সেই কাজে অংশগ্রহণ করে যে কাজের যোগ্যতা আছে সে কাজটিকেও বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়ার যুক্তি খুঁজে পাওয়া একেবারেই অসম্ভব।

বস্তুতঃ নারীর স্বভাবতঃই যে কাজের যোগ্যতা রয়েছে, তার জন্যে কেবল সেই কাজের পরিকল্পনাই নেয়া যেতে পারে। সে কাজ যদি হীন ও নীচ ধরনের বলে মনে করা হয়, তাহলে নারীর স্রষ্টাকেই প্রশ্ন করা উচিত, তিনি তাকে নারী করে সৃষ্টি করলেন কেন? অথবা নারীর জন্যে প্রথমে ইচ্ছামত একটা পরিকল্পনা তৈরী করে সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী তার মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন আনবার জন্যে চেষ্টা করতে হবে। এ ছাড়া আর কি উপায় থাকতে পারে?

প্রশ্ন উঠতে পারে, নারী যে বিশেষ একটি ক্ষেত্রেই কাজ করতে পারে, এ মতটি কি এ কালে বদলে গেছে? না, যায়নি। বদলে যাওয়ার কোন কারণও

ঘটেনি। সভ্যতার বর্তমান উন্নতি-অগ্রগতির মূলে নারীদের সর্বক্ষেত্রেই পুরুষদের সমান অবদান রয়েছে বলে দাবি করা হলে ইতিহাসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী কথা বলা হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ ও অগ্রগতিতে নারীদের অংশ খুবই সামান্য। এই ক্ষেত্রে নারী সমাজ উল্লেখযোগ্য কোন অবদানই রাখতে পারেনি। দর্শন ও বিজ্ঞানের কোন একটি বিভাগেও নারীর একক কোন মহান কীর্তির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তার কারণও রয়েছে। এসব কাজের ক্ষেত্র নারীর স্বভাব উপযোগী নয়। এসব ক্ষেত্রে বড় রকমের কিছু করার যোগ্যতাও তার নেই। সে যদি এক্ষেত্রে পা রেখেও থাকে, তবে সে এখানে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক সত্তা। এক্ষেত্রে কাজ করার যত সুযোগ-সুবিধা বা স্বাধীনতাই তাকে দেয়া হোক, পুরুষের কর্মক্ষমতা ও কাজের গতির সাথে তাল রেখে চলা তার পক্ষে সম্ভবই নয়। একালের পাশ্চাত্য চিন্তাবিদরাই এই সত্য অকপটে স্বীকার করেছেন। সমাজ ও রাষ্ট্রে একজন স্বল্প শিক্ষিত পুরুষও এক উচ্চশিক্ষিতা নারীর তুলনায় অনেক বেশী অবদান রাখতে সক্ষম। কেননা নারী পুরুষ উপযোগী কাজ করতে গেলে তার নারীত্বই সে কাজের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তাই বলতে হয়, একালে নারীদের যে দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে, তাদের স্বভাবগত প্রবণতাই সেদিকে চলতে অস্বীকার করছে। ফলে নারীর সত্যিকার কোন কল্যাণ করা হচ্ছে না, বরং তার সাথে করা হচ্ছে মহাশত্রুতা। একালের নারীদের একান্তভাবে ঘর-গৃহস্থালীর কাজ করতে না দিয়ে ব্যাপকভাবে তাদের অফিস-বিপণী ও সিনেমা-নাটকের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ফলে পুরুষরা কেবল বাইরের কাজ করে অবসর পেলেও নারীকে ঘর ও বাইর–উভয় ক্ষেত্রেই কলুর বলদের মত খেটে যেতে হচ্ছে। এহেন মর্মান্তিক অবস্থার মধ্যে সৃষ্টিলোকের অন্য কোন প্রাণীকেই আজ পর্যন্ত পড়তে হয়নি। প্রখ্যাত মনীষী আর্নল্ড টয়েনবি বলেছেনঃ দুনিয়ার পতন যুগ সাধারণভাবে তখনই সূচিত হয়েছে, যখন নারী ঘরের চার দেয়াল ডিঙ্গিয়ে বাইরে পা রেখেছে।

প্রাচীনকালের ইতিহাসেও এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ লক্ষ্য করা যায়। খৃস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর গ্রীস উন্নতির উত্তুঙ্গ পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। কিন্তু তখন নারী ছিল ঘরের সৌন্দর্য। আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট-এর পর নগর-কেন্দ্রিক রাষ্ট্রসমূহের পতনকালে বর্তমান কালের ন্যায়ই এক নারীমুক্তি আন্দোলনের শুরু হয়েছিল। এই আন্দোলনই গ্রীসের সামাজিক পতন ও বিপর্যয়ের সূচনা করেছিল। টয়েনবীর বিশ্লেষণ থেকে এ কথা স্পষ্টভাবে জানা গেছে।

বস্তুতঃ নারীর আসল স্থান তার ঘর। এই ঘর ছেড়ে দিলে যে পতন ও বিপর্যয় সূচিত হয়, তার দুটি কারণ হতে পারেঃ একটি এই যে, এর ফলে সমাজের মৌল উৎস-কেন্দ্রই অচলাবস্থার সম্মুখীন হয় এবং বহু সমস্যাই নিষ্পত্তিহীন ও অসম্পাদিত অবস্থায় থেকে যায়। কেননা যে নারীর নিপুণ হস্ত এই সমস্যার সমাধান করবে, তাই সেখানে অনুপস্থিত। এ কাজ নারীর পরিবর্তে পুরুষদের দ্বারা কখনই সমাধা হতে পারে না। আর দ্বিতীয় কারণ, এর ফলে নারী ও পুরুষ–উভয়ের তৎপরতা ও কর্মব্যবস্থা এমন একটা দিকে চলতে থাকে, ইতিহাসের সিদ্ধান্ত অনুসারে যেদিকে চলে কেউ কোনদিন সাফল্য বা কিছুমাত্র কল্যাণ লাভ করতে পারেনি।

এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, সমাজে নারী ও পুরুষদের সঠিক স্থান কি এবং এ দুয়ের মাঝে সম্পর্কের সঠিক রূপ কি–তা নির্ধারণ করতে প্রাচীন কালের মতবাদগুলো যেমন অসমর্থ রয়ে গেছে, তেমনি করুণভাবে ব্যর্থ হয়েছে একালের নব্য মতবাদগুলোও। কাজেই সমাজে নারী ও পুরুষের সঠিক স্থান এবং এ দুয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের স্বভাবসম্মত ও যথার্থ রূপ নির্ধারণের ব্যাপারে ভারসাম্যপূর্ণ ও অনাসক্ত চিন্তা-বিবেচনার প্রয়োজন বর্তমানে অত্যন্ত তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে।

এই চিন্তা-বিবেচনার প্রসঙ্গে কয়েকটি মৌলিক বিষয় চোখের সামনে চির উদ্ভাসিত রাখা আবশ্যক। আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, মানুষকে যে দুই লিঙ্গে বিভক্ত করে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা কিছুমাত্র নিরর্থক বা উদ্দেশ্যহীন নয়। এই দুই লিঙ্গের পারস্পরিক ও সম্মিলিত সহযোগিতায়ই মানব বংশের ধারা শতাব্দীর পর শতাব্দীকাল ধরে অব্যাহতভাবে চালু রাখা সম্ভবপর হয়েছে। ফলে যে লিঙ্গের লোককে স্বভাবতঃই যে যোগ্যতা ও ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, তার দ্বারা ঠিক সেই কাজই গ্রহণ করা হলে কোন অসুবিধা বা বিপর্যয়ের আশঙ্কা থাকতে পারে না। এ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেকের স্বভাবগত যোগ্যতা সৃষ্টি-উদ্দেশ্যের পূর্ণতা বিধানে নিয়োজিত হলেই স্বাভাবিক নিয়মের সাথে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলা সম্ভবপর হতে পারে।

আর এজন্যে সাধারণভাবে পুরুষ ও নারীর কর্মক্ষেত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হওয়া আবশ্যক। কিন্তু তাই বলে বিশেষ এক লিঙ্গের লোকদের মধ্যে বিশেষ ধরনের যোগ্যতা থাকার কারণেই তাদেরকে অপর লিঙ্গের লোকদের ওপর অস্বাভাবিক ও অবাঞ্ছনীয় ধরনের প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দিতে হবে, এমন কোন কথা নেই; বরং সামাজিক ব্যবস্থা এমন হতে হবে, যার ফলে দুই লিঙ্গের কোন লোকই যেন নিজের জন্যে নির্দিষ্ট কাজকে কোনরূপ গর্ব-অহঙ্কার কিংবা লজ্জা-অপমান-লাঞ্ছনা ও হীনতা-নীচতার কারণ বলে মনে করতে না পারে। প্রত্যেকেই যাতে স্বীয়

স্বভাবজাত যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করে সম্মান ও মর্যাদা লাভের অধিকারী হতে পারে, তার সুযোগ থাকতে হবে। পক্ষান্তরে নর-নারীর স্বভাব-প্রকৃতির পরিপন্থী কর্মকান্ড ও চেষ্টা-সাধনাকে কোনক্রমেই চলতে দেয়া উচিত হবে না। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে প্রত্যেক লিঙ্গের লোকেরাই নিজেদের বিশেষ ক্ষেত্রে উন্নতি ও অগ্রগতি লাভের অধিকারী হবে। আর তার বাইরে তাদের তৎপরতা, যতদূর সম্ভব কম করে দিতে হবে।

প্রশ্ন করা যেতে পারে, এইরূপ ব্যবস্থা হলেই কি পুরুষরা অবলা নারীদের সাথে মমতাভিত্তিক আচরণ গ্রহণ করবে এবং অধিকার ও মর্যাদা প্রশ্নে তাদের প্রতি সুবিচার করবে? নারীদের দুর্বল মনে করেই তো আবহমান কাল থেকে পুরুষরা তাদের ওপর কর্তৃত্ব চালিয়ে এসেছে, নিজেদের দাসত্ব নিগড়ে বন্দী করে রেখেছে। দুর্বলদেরকে দুর্বল করে রাখতেই যে তারা তৎপর হবে এবং কোনক্রমেই মাথা তুলে মানুষের অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকতে দিবে না, অভিজ্ঞতার আলোকে এ আশংকাই তো প্রবল হয়ে দেখা দেয়। তাহলে প্রস্তাবিত স্বভাবসম্মত ব্যবস্থা সমস্যার কতটা সমাধান দিতে পারবে?

এই প্রশ্নের জবাবে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, উপরে যে ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, তা বাস্তবায়িত হলে তাতে এরূপ আশংকার সম্ভাবনা আদৌ থাকবে না। কেননা নারীদের প্রতি পুরুষদের যে অমানুষিক আচরণের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, তা নিতান্তই অস্বাভাবিক কর্মকান্ডের পরিণতি। নারী ও পুরুষ নিজ নিজ স্বভাবসম্মত কর্মক্ষেত্র ত্যাগ করে যে অস্বাভাবিকতার আশ্রয় নিয়েছে ও স্বাভাবিকতার সীমা লংঘন করেছে, তারই ফলে এরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়া সম্ভবপর হয়েছে। সেখানে উভয়ের আচরণে যদি স্বাভাবিকতাকে ভিত্তি করা হত, তাহলে এই অস্বাভাবিকতা দেখা দিতে পারত না। কাজেই স্বাভাবিক ব্যবস্থায় অস্বাভাবিকতা যে অপনা-আপনি বিদূরিত হবে, তা খুবই স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়ত, সমাজের স্বাভাবিক অবস্থা রক্ষার জন্যে অনুকূল আইন-বিধানের বলিষ্ঠ সক্রিয়তা অপরিহার্য। স্বাভাবিক অবস্থাকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে উভয় লিঙ্গের সুস্থ-সঠিক শিক্ষণ-প্রশিক্ষণের ব্যাপক ব্যবস্থা থাকার সঙ্গে সঙ্গে যদি কঠোর নিশ্চিত জবাবদিহি ও শাসন-প্রশাসনের ভয় প্রকটভাবে কার্যকর থাকে এবং প্রশাসন ব্যবস্থাও থাকে অতীব সবল, তাহলে কোন পক্ষ থেকেই উল্লেখিত ধরনের অবাঞ্ছিত আচরণের আদৌ কোন আশংকা থাকতে পারে না। এই ব্যবস্থায় নারীর অবস্থান হবে সুদৃঢ়। তার স্বভাবগত দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও তাকে মজলুম ও দারিদ্র-প্রপীড়িত করে রাখা সম্ভবপর হবে না। বলা ও লেখনী চালনার মাধ্যমে নিজেদের বক্তব্য সমাজের সম্মুখে তুলে ধরার পূর্ণ অধিকার থাকবে

নারীর। রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা ব্যবহারের সমান অধিকার থাকবে তাদের। তাদের ওপর কোনরূপ অবিচার করার ক্ষমতাও কারুর থাকবে না। তাদের জান-মাল ও ইজ্জত-আবরু হবে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। পিতা-মাতা, স্বামী, প্রশাসক কেউই তাদের ওপর কোন বেআইনী কাজের চাপ প্রয়োগ করতে পারবে না। আইনের এই কঠোরতার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষদের মধ্যে নারীদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ এবং স্নেহ ও ভালবাসা জাগিয়ে তোলা হবে।

এ যদি বাস্তবিকই করা যায়, তাহলে নারী-পুরুষের কর্মক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন করে দিলে এবং প্রত্যেককে তার স্বভাবগত যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করার ও উন্নতি অগ্রগতি লাভের সুযোগ দেয়া হলে কোন সমস্যাই থাকবে না। বস্তুতঃ এইরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন করেই ধ্বংস ও বিপর্যয়ের মুখে নিপতিত বর্তমান বিশ্ব-মানবতাকে রক্ষা করা সম্ভব। শুধু রক্ষাই নয়, তাকে উত্তরোত্তর প্রকৃত কল্যাণের অধিকারী বানানোও এ পন্থায়ই সম্ভব হবে, একথা দৃঢ়তার সাথেই বলা যায়।

বলা বাহুল্য, এইরূপ স্বভাবসম্মত ব্যবস্থা দুনিয়ার বুকে উপস্থাপন করেছে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র প্রদত্ত দ্বীন-ইসলাম। ইসলামই যে মানবতার জন্য স্বভাবসম্মত দ্বীন–জীবন ব্যবস্থা–তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

ইসলামী সমাজে নারী

মৌলিক ধারণা

বিশেষ কতগুলো মতবাদ ও চিন্তাধারার ভিত্তিতেই এক একটা সামাজিক সংস্থা ও কাঠামো গড়ে উঠে। তাই কোন সমাজ-সংস্থা ও কাঠামোর প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়ের জন্যে সর্বপ্রথম প্রয়োজন সেই বিশেষ মতবাদ ও চিন্তাধারা অনুধাবন। কেননা এই চিন্তাধারাই সেই সমাজ-কাঠামোর স্বভাব-চরিত্র ও মেজাজ-প্রকৃতি রূপায়িত করে। সমাজের লোকদের মধ্যে কার স্থান কোথায় এবং কার গুরুত্ব কোন দিক দিয়ে কতটা এবং কার কি অধিকার ও কর্তব্য—তা সেই চিন্তা ও মতাদর্শই নির্ধারণ করে দেয়। সেগুলোর ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে সমাজের ও জনজীবনের ভাবধারা। সমাজের ব্যক্তিদের সাথে আচার-আচরণও পরিচালিত হয় সেই চিন্তা ও মতাদর্শের দৃষ্টিতেই। ইসলামী সমাজ-কাঠামোও ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে বলে এই সমাজে নারীর স্থান কোথায়, তার মান-মর্যাদা ও অধিকার কি এবং তার কর্তব্য ও দায়িত্ব কি, তা জানবার জন্যে সর্বপ্রথম জানতে হবে, ইসলাম নারীদের সম্পর্কে কি ধারণা দিয়েছে। এই ধারণার কথা সঠিকভাবে জানতে পারলেই নারী সম্পর্কিত সকল প্রশ্নের জবাব পাওয়া সম্ভব এবং সহজ হবে।

মানুষ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিকোণ

ইসলাম নারী সম্পর্কে কি ধারণা দিয়েছে, তা জানার জন্যে মানুষ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিকোণ সর্বপ্রথম বিবেচ্য। এই পর্যায়ে সংক্ষেপে বলা যায়, ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ অতীব সম্মানিত ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। সর্বপ্রকার নীচতা, হীনতা ও লাঞ্ছনা-অপমান থেকে ইসলামই মানুষকে মুক্ত ও উদ্ধার করেছে; তাকে পৌঁছে দিয়েছে মান-মর্যাদার তুঙ্গে। মানুষকে আত্মমর্যাদাবোধের শিক্ষা দিয়েছে ইসলাম। আর এ কারণেই ইসলাম উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছে; মানুষ আল্লাহ্‌র সেরা সৃষ্টি। সৃষ্টিকুলের মধ্যে মানুষ সর্বাধিক মর্যাদাবান। সেই সঙ্গে মানুষ শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র বান্দাহ্ অন্য কারো নয়। এক কথায়, সবার উপরে মানুষ সত্য, তার উপরে আল্লাহ্। মানুষ আল্লাহ্ ছাড়া বিশ্বলোকের কোন কিছুরই নীচে নয়। কারুর তুলনায়ই ছোট বা হীন নয়। মানুষ মাথা নত করবে একমাত্র বিশ্বলোকের স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক-পরিচালক মহান আল্লাহ্‌র সামনে—আর কারুর নয়। সর্বোপরি মানুষ এই পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র খলীফা। এর

সব কিছুই মানুষের অধীন আর মানুষ অধীন হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ্‌র। বিশ্বলোকের সবকিছুই মানুষের জন্যে আর মানুষ হচ্ছে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যে–আল্লাহ্‌র বন্দেগীর জন্যে।

বস্তুতঃ মানুষের এই সম্মান ও মর্যাদার কথা কেবল ইসলামই ঘোষণা করেছে। তাই মানুষ সম্পর্কে অমর্যাদাকর কোন ধারণা পোষণ করা চলতে পারে না। কোন অশোভন আচরণও গ্রহণ করা যাবে না মানুষ সম্পর্কে। কেউ যদি মানুষের প্রতি খোদাপ্রদত্ত মর্যাদার পরিপন্থী কোন কথা বলে বা আচার-আচরণ গ্রহণ করে, তবে সে খোদার প্রতিই চ্যালেঞ্জ করে। ইসলাম এই ধরনের কোন চ্যালেঞ্জ বরদাশত করতে প্রস্তুত নয়।

বস্তুতঃ ইসলাম জন্মগতভাবে মানুষকে এ মর্যাদা দিয়েছে। তবে মানুষ নিজেই যদি তার নিজের চরিত্র ও কার্যকলাপের ফলে সাধারণ জীব-জন্তুরও নীচে নেমে যায়, তবে তা হবে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা।

মানুষ সম্পর্কে ইসলামের এই ঘোষণা পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্যেই সমানভাবে শাশ্বত ও চিরন্তন। মানবিক সম্মান ও মর্যাদার বিচারে নারী ও পুরুষের মাঝে কোনই পার্থক্য বা ভেদাভেদ নেই। নারীকে শুধু নারী হয়ে জন্মাবার কারণে পুরুষের তুলনায় হীন ও নীচ মনে করা সম্পূর্ণ জাহিলী ধ্যান-ধারণা; এরূপ চিন্তা-ভাবনা ইসলাম স্বীকার করে না।

তবে নারী হোক বা পুরুষ হোক, তার খোদাপ্রদত্ত এই সম্মান ও মর্যাদাকে তার নিজের বাস্তব চরিত্র ও কাজ-কর্মের সাহায্যেই রক্ষা করতে হবে। কেননা মানুষের ঘোষিত মান-মর্যাদা কেবলমাত্র এই দিক দিয়েই গ্রহণীয়। আল্লাহ্ তা'আলা নিজের ইচ্ছা ও কুদরাতে মানুষকে সৃষ্টি করে তাকে এই মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। এখন তা রক্ষা করা মানুষের দায়িত্ব। স্বভাব-চরিত্র ও অভ্যাস-আচরণের দিক দিয়ে মানুষ যদি মানবেতর পর্যায়ে পৌঁছে যেতে চায়, তবে ইসলাম তা রক্ষা করতেও প্রস্তুত নয়।

এই কথার প্রমাণ স্বরূপ কুরআন মজীদের অসংখ্য আয়াত থেকে দুটি ছোট্ট আয়াত এখানে উল্লেখ করছি।

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَ فَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا*

(بنی اسرائیل: ۷۰)

আর নিশ্চিত জানবে, আমরা আদম বংশ–মানুষকে অত্যন্ত সম্মানার্হ করেছি, জলে-স্থলে তাদের করেছি কর্তৃত্ব-সম্পন্ন, পবিত্র রিজিক দিয়েছি তাদের এবং আমাদের বহু সংখ্যক সৃষ্টিকুলের ওপর বিশষ ধরনের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বও তাদের দিয়েছি।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ*

(النحل :٩٧)

পুরুষ হোক কি নারী, যে-ই পূণ্যময় কাজ করবে ঈমানদার হয়ে, তাকেই আমরা উত্তম পবিত্র জীবন যাপনের সুযোগ দিব এবং তাদের উত্তম আমলসমূহের শুভ প্রতিফল তাদের দান করব।

অর্থাৎ মানব জাতির নারী-পুরুষ এই উভয় সৃষ্টির মধ্য থেকে যে-কেউই উত্তম স্বভাব-চরিত্র ও কাজ-কর্মের ধারক হবে, সে-ই প্রকৃতপক্ষে সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হবে। কে নারী আর কে পুরুষ, এই প্রশ্ন এক্ষেত্রে একেবারেই অবান্তর। পক্ষান্তরে নারী বা পুরুষ যে-ই তার আমল-নামাকে কলুষ-কালিমা লিপ্ত করবে, সে-ই চরমভাবে ব্যর্থ হবে। এখানে নারী-পুরুষের মাঝে কোনরূপ পার্থক্য করা হবে না।

কুরআন মজীদের সূরা তওবার একটি দীর্ঘ আয়াতে ঈমানদার লোকদের কতকগুলো গুণের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এসব গুণ হল নিজেদের জান-মাল, কামনা-বাসনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা সব কিছুই আল্লাহ্র মর্জীর অধীন ও অনুগত বানিয়ে দেয়া। সূরা আত্-তাহ্রীমের একটি আয়াতে এসব গুণ অর্জনের জন্য নবী করীম (স)-এর বেগমদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, এসব গুণ অর্জন না করে তাঁরা নবীর বেগম হয়ে থাকতে পারবে না। কেননা এসব গুণের অধিকারিণী স্ত্রী লাভ নবীর জন্যে কিছুমাত্র কঠিন হবে না।

এসব কথা থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, কুরআনের দৃষ্টিতে ইহকালীন সৌন্দর্য, কল্যাণ ও তাকওয়া এবং পরকালীন সাফল্য অর্জনের উপায় ও মানদণ্ড পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্যে সম্পূর্ণ এক ও অভিন্ন। তা অর্জন না করে পুরুষরা যেমন কল্যাণ লাভ করতে পারে না, তেমনি পারে না নারীরাও।

নারী ও পুরুষ উভয়ই সভ্যতা-সংস্কৃতির নির্মাতা

কুরআন মজীদ একথাও ঘোষণা করেছে যে, জীবনের সংগ্রাম-সাধনায় এবং সভ্যতা-সংস্কৃতি নির্মাণে নারী ও পুরুষ উভয়ই চিরকাল পরস্পরের সহযোগী ও সাহায্যকারী হয়েই রয়েছে। জীবনের দুর্বহ বোঝা উভয়ই একত্রে বহন করেছে। উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফলেই সাধিত হয়েছে সমাজ ও সভ্যতার বিকাশ এবং উন্নয়ন। দুনিয়ার কোন জাতি বা কোন আন্দোলনই নারী-পুরুষ কাউকেই বিন্দুমাত্র উপেক্ষা করতে পারে না। সত্যের উৎকর্ষ ও প্রতিষ্ঠা এবং তার কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য সংস্থাপন প্রচেষ্টায় নারী ও পুরুষের যৌথ চেষ্টা-প্রচেষ্টার কাহিনী বিশ্ব-ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। বাতিল নীতি ও আদর্শ প্রতিষ্ঠা প্রচেষ্টায়ও তার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় না। কুরআন মজীদে এই উভয় শ্রেণীর লোকদের পরিচিতি উদ্ধৃত হয়েছে। সূরা তওবার একটি আয়াতে মুনাফিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَ الْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَ يَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ*

মুনাফিক পুরুষ ও নারী পরস্পর সংঘবদ্ধ। তারা সকলে মন্দ কাজের আদেশ করে ও ভাল কাজের নিষেধ করে। আর আল্লাহ্র পথে অর্থব্যয় করা থেকে হাত গুটিয়ে রাখে। তারা আল্লাহ্কে ভুলে গেছে এবং আল্লাহ্ও ভুলে গেছেন তাদের। প্রকৃতপক্ষে মুনাফিকরাই সীমা লংঘনকারী।

পক্ষান্তরে ঈমানদার লোকদের সম্পর্কে এই সূরা তওবায়ই বলা হয়েছেঃ

وَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ يُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ*

ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী পরস্পরের সহায়ক। তারা মিলিতভাবে সব ভাল ও কল্যাণকর কাজের আদেশ করে, সব অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে নিষেধ করে। তারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর

রাসূলের আনুগত্য করে চলে। আল্লাহ্ এদের অবশ্যই রহমত দান করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সর্বজয়ী, মহাবিজ্ঞানী।

বস্তুতঃ সভ্যতা-সংস্কৃতির সব উত্থান-উন্নতিই নারী-পুরুষের সম্মিলিত চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফসল। তাহলে এ দুয়ের মাঝে একজনের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করা হবে আর অপরজনের প্রতি করা হবে ঘৃণা ও বিদ্বেষ, তার কি কারণ বা যুক্তি থাকতে পারে? কালের ভাল ও মন্দ–ভাঙন ও গড়ন যখন উভয়ের হাতেই হয়ে থাকে, তখন তাদের একজনকে সভ্যতার অঙ্গন থেকে বহিস্কৃত করে শুধুমাত্র একজনের স্কন্ধে সবকিছু চাপিয়ে দিয়ে সভ্যতা-সংস্কৃতিকে অগ্রসর করে নিতে চাওয়া কি চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক নয়? কোন ব্যক্তি কি নিজ দেহের এক অংশকে অক্ষম অকর্মন্য বানিয়ে রেখে কেবলমাত্র একটি অংশ নিয়ে জীবন সংগ্রামে স্বীয় দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হতে পারে?

নারী সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিকোণ

ইসলাম আগমনের পূর্বে দুনিয়া নারীকে অকেজো ও অকল্যাণকর–সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিপন্থী বা তার প্রতিবন্ধক মনে করে জীবনের কর্মক্ষেত্র থেকে একেবারে বাইরে ফেলে দিয়েছিল। তাকে নিক্ষেপ করা হয়েছিল নিষ্ক্রিয়তার এমন এক গহ্বরে, যেখান থেকে উঠে আসা ও উত্থান-অগ্রগতি লাভ করা কোনক্রমেই সম্ভবপর ছিল না। ইসলাম এই অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আওয়াজ তুলেছে। উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছে–মানব জীবনধারা সমানভাবে নারী ও পুরুষ উভয়েরই মুখাপেক্ষী। নারীকে সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ এ অপরিহার্য অংশরূপেই সৃষ্টি করা হয়েছে। জীবনের রাজপথ থেকে কাঁটার ন্যায় তুলে দূরে নিক্ষেপ করার জন্যে তাকে সৃষ্টি করা হয়নি। কেননা পুরুষকে যেমন উদ্দেশ্যমূলকভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে–তাকে দেয়া হয়েছে একটা সুস্পষ্ট জীবন লক্ষ্য, নারীদের ব্যাপারেও ঠিক এ কথাই সত্য। তারও জীবন লক্ষ্য সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট। উভয়ের জীবন-উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হওয়াই স্রষ্টার ইচ্ছা। বিশ্বলোকের স্রষ্টা যিনি, তিনিই সৃষ্টি করেছেন নারী ও পুরুষ। ইসলাম নারী সমাজকে হীনতার নিম্নতম পঙ্ক থেকে অনেক ঊর্ধ্বে তুলেছে। ইসলাম-পূর্ব দুনিয়ায় নারী জীবনে শুধু বেঁচে থাকার অধিকার থেকেও বঞ্চিত ছিল। কিন্তু কুরআন ঘোষণা করেছেঃ না, নারীও বাঁচবে। বাঁচবার–মানুষের মত মান-মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার তাদেরও রয়েছে। সে অধিকার কেউ হরণ করতে পারে না, হরণ করার অধিকার কারুর নেই। নবী করীম (স) এই উপেক্ষিত-বঞ্চিত নারী সমাজের অবস্থার উন্নয়ন ও সঠিক মর্যাদায় তাদের প্রতিষ্ঠিত করা প্রসঙ্গে যে

উন্নত মানের শিক্ষা পেশ করেছেন, নারী-মুক্তির কোন উচ্চ কণ্ঠ সমর্থকই আজ পর্যন্ত সেই মানের শিক্ষা পেশ করতে পারেনি। একটি ঘোষণায় রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ

إنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَمَنْعًا وَهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ (بخارى)

আল্লাহ্ তা'আলা মায়েদের নাফরমানী, তাদের অধিকার আদায় না করা, চারদিক থেকে ধন-সম্পদ লুণ্ঠন ও সঞ্চিত করা এবং মেয়ে সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করাকে তোমাদের জন্য চিরতরে হারাম করে দিয়েছেন।

তিনি আরও বলেছেনঃ যে লোকের কন্যা সন্তান হবে, সে যদি তাকে জীবন্ত প্রোথিত না করে বা তার প্রতি কোনরূপ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যমূলক আচরণ না দেখায় ও নিজের পুত্র সন্তানকে তার ওপর অগ্রাধিকার না দেয়, তবে আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন।

বলেছেন, 'যে লোক তিন-তিনটি কন্যা সন্তানের লালন-পালন করবে ও তাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করবে, তার জন্যে জান্নাত রয়েছে। কন্যা সন্তান লালন-পালন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তাদের প্রতি ভাল আচরণ করা হলে তা জান্নাতে যাওয়ার কারণ হবে। বস্তুতঃ এ হচ্ছে নারীর প্রতি অতি উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ ঘোষণা। এই প্রসঙ্গেরই একটি লম্বা হাদীসের শেষ ভাগে রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন:

بَابَانِ مُعَجَّلَانِ عُقُوبَتُهُمَا فِى الدُّنْيَا الْبَغْىُ وَالْعُقُوقُ، (ترمذى حاكم)

দুটি পথ এমন রয়েছে, যেখান থেকে পৃথিবীতে খুব শীঘ্র ও দ্রুতগতিতে আযাব নাজিল হয়ঃ একটি জুলুম ও সীমালংঘন এবং দ্বিতীয়টি পিতা-মাতার নাফরমানী ও তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা।

কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই কথায় এক অতীব উচ্চ ও নিগূঢ় তত্ত্বের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। বস্তুতঃ জুলুম ও সীমালংঘন এমনিতেই বেশী দিন চলতে পারে না। কিন্তু তা যদি হয় নিজেরই ঔরষজাত সন্তানের ওপর কিংবা যদি হয় নিজেরই জন্মদাতা মা-বাবার ওপর, তাহলে মজলুমের বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাসের পূর্বেই জালিমের আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে যেতে বাধ্য।

ঠিক যে সময়কার জগতে নারীকে সর্বপ্রকার পাপের উৎস—পাপ ও গুনাহ্র প্রতিমূর্তি মনে করা হত, সে সময়ই এমন এক মহান ব্যক্তি এই সব কথা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, যিনি চরিত্র মাধুর্য ও পবিত্রতায় অতুলনীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন, যিনি দুনিয়ায় তাক্ওয়া ও খোদাভীতির নীতি অবলম্বনের আহবান

জানিয়েছেন। যাঁর আগমনই হয়েছিল দুনিয়াকে পাপ ও নির্লজ্জতার পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে। বলেছেনঃ

حُبِّبَ اِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَ الطِّيبُ،

দুনিয়ার জিনিসগুলোর মধ্য থেকে নারী ও সুগন্ধীই আমার নিকট প্রিয়তর বানিয়ে দেয়া হয়েছে।

অন্য কথায়, নারীর প্রতি ঘৃণা পোষণ, নারী বর্জন এবং পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা ও সুগন্ধী এড়িয়ে যাওয়া খোদা-ভীতির প্রমাণ বা লক্ষণ নয়। আল্লাহ্‌র প্রতি অকৃত্রিম ঈমান, তাঁর সাথে সম্পর্কের দৃঢ়তা ও মজবুতি, খোদার ভয় ও আনুগত্যই হল তাক্‌ওয়া। এই তাক্‌ওয়াই কাম্য। নারীর সাথে বৈধ সম্পর্ক রাখা বা নারীর প্রতি সম্মান-শ্রদ্ধাবোধ কিছুমাত্র তাক্‌ওয়া বিরোধী কাজ নয়। এসব করেও খোদার নেক ও প্রিয় বান্দাহ্ হওয়া সম্ভব। শুধু সম্ভবই নয়– এসবের মধ্য দিয়ে খোদার সন্তোষ অর্জন করাই ইসলামের দেখানো পথ।

ইসলামের এই শিক্ষা তৎকালীন মানব সমাজে চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে একটি তুলনাহীন বিপ্লবের সৃষ্টি করেছিল। যে সব লোক নিষ্পাপ কন্যা সন্তানকে মাটির গর্তে জীবন্ত প্রোথিত করতে একবিন্দু দ্বিধাবোধ করত না–হৃদয় কেঁপে উঠতো না, তারাই এই পরিবর্তিত পরিবেশে তার (কন্যা সন্তানের) লালন-পালনে সর্বশক্তি নিয়োগ করতেও কুণ্ঠিত হয়নি। যাদের কাছে নিজেদের শিশু-সন্তানদেরও একবিন্দু নিরাপত্তা ছিল না, তারাই অন্যদের অসহায় সন্তানদের লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ত। এ দায়িত্ব গ্রহণ করে নিজেদের ধন্য মনে করত, পরকালীন মহাকল্যাণ লাভে উদ্যোগী হত।

একালের উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা হচ্ছেঃ বিশিষ্ট সাহাবী হযরত জাবির (রা) তাঁর সাতটি পিতৃহীনা বোনের লালন-পালনের জন্যে কোন যুবতী কুমারী মেয়ে বিয়ে না করে একজন বয়স্ক বিধবাকে বিয়ে করে আনলেন; অথচ তিনি ছিলেন অল্প বয়স্ক যুবক। –বুখারী

হযরত হামজা (রা)-এর শাহাদাত প্রাপ্তির পর তাঁর কন্যার লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে হযরত আলী (রা) দাবি করলেন। বললেনঃ এ আমার চাচাতো বোন। এর লালন-পালনের দায়িত্ব আমারই বহণ করার অধিকার রয়েছে। হযরত জাফর (রা) বললেনঃ আমি আলীর চেয়েও বেশী অধিকারী। কেননা, এই মেয়ে আমার চাচাতো বোনই শুধু নয়, এর খালা আমার ঘরেই রয়েছে। তৃতীয় দিকে হযরত জায়েদ (রা) দাবি জানালেন, হযরত হামজা (রা)

ছিলেন রাসূলের পাতিয়ে দেয়া আমার ভাই। আর এই সূত্রেই আমি চাচা হিসেবে এই মেয়ের লালন পালনের দায়িত্ব গ্রহণের সুযোগ পাওয়ার সর্বাধিক অধিকারী। (নাইলুল আওতার)

চিন্তা ও কর্মে সৃষ্ট এই বিপ্লবের দৃষ্টান্ত দুনিয়ার অপর কোন বিপ্লব-ইতিহাসে পাওয়া যায় কি? ইসলামের এই শিক্ষা ছিল অত্যন্ত বলিষ্ঠ। ফলে সর্ব প্রকারের জুলুম-নিপীড়নের অক্টোপাশ অচিরেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। এই শিক্ষার ওপর সেই সমাজের লোকদের ছিল সুদৃঢ় ঈমান ও প্রত্যয়। আর এইরূপ ঈমান ও প্রত্যয় যাদের থাকে, তারা কোন সময় সুবিচার, ন্যায়পরতা ও সদাচরণের সীমা লংঘন করতে পারে না।

মৌলিক অধিকারের সমতা

ইসলাম সুবিচার ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যে কেবলমাত্র উৎসাহব্যঞ্জক উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, নারী ও পুরুষ উভয়ের অধিকার আইনের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিতও করেছে। সে আইন সর্বদিক দিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ। তা প্রতিষ্ঠিত ও পুরোপুরি কার্যকর হলে না নারীর পক্ষে অভিযোগ তোলার একবিন্দু কারণ থাকবে, না পুরুষের। আর তাহলে না পুরুষ কোনরূপ অবিচার বা নিপীড়ন চালাবার সুযোগ পাবে, না নারীর দুঃখ-দুর্দশা বা অপমান-লাঞ্ছনার থাকবে সামান্য অবকাশ।

বস্তুতঃ ইসলামী আদর্শে গঠিত সমাজই হচ্ছে মানুষের সকল প্রকার অধিকার বাস্তবায়িত করার ও কার্যকর রাখার জন্যে দায়ী। তাই যে হাত জুলুম-অবিচারের জন্যে উর্ধ্বে উঠবে, সমাজ সেই হাতটিকে অবিলম্বে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ধ্বংস প্রতিহত করবে।

কুরআন মজীদ উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেঃ

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَّاُولِي الْاَلْبَابِ،

হে বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা! আইনভিত্তিক বিচার-ব্যবস্থা শাণিতভাবে কার্যকর হওয়াতেই তোমাদের জীবন নিহিত।

হত্যাকারী নারী হোক কিংবা হোক পুরুষ, হত্যাপরাধের শাস্তি স্বরূপ তার প্রাণ হরণ করা হবে–নিহত ব্যক্তি পুরুষ হোক কিংবা নারী। কেননা মানুষ মাত্রেরই প্রাণ ও জীবন সম্মানার্হ, সে নারীর হোক বা হোক পুরুষের প্রাণ। যারই হাত কারও রক্তে রঞ্জিত হবে, তার শুধু সে হাতটিই নয়, হাতের ধারক ব্যক্তির

জীবনটিও নিঃশেষে বিনাশপ্রাপ্ত হবে। রাসূলে করীম (স)-এর জারীকৃত আইনের একটি ধারা হচ্ছেঃ

إِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ. (السنن الكبرى ج ص ٢)

স্ত্রীলোকের হত্যাকারী কোন পুরুষ হলে শাস্তিস্বরূপ তাকে হত্যা করা হবে।

একজন ইয়াহুদী (অমুসলিম নাগরিক) একটি মেয়েকে হত্যা করেছিল। এই হত্যাকাণ্ডের বিচারে তাকে হত্যা করা হয়েছিল। হযরত উমর (রা) একজন স্ত্রীলোকের হত্যাকাণ্ডে কয়েকজন পুরুষ জড়িত প্রমাণিত হওয়ায় বিচারে সকলকেই মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন (احكام القران)। ইসলামী আইনে এই ব্যাপারে নারী-পুরুষে কোন পার্থক্য করা হয়নি। স্ত্রীলোকের চক্ষু, কান কিংবা অন্য যে কোন অঙ্গের জখমের জন্যে পুরুষ দায়ী হলে তাকে অনুরূপ দণ্ডে দণ্ডিত হতে হবে। অনুরূপভাবে কোন নারী যদি তার কোন আপনজনের হত্যার শাস্তি স্বেচ্ছায় ক্ষমা করে দেয়, তাহলে সে ক্ষমাও কার্যকর হবে। কেননা ইসলামী আইনে এরূপ বিধান রয়েছে এবং এ বিধান অবশ্যই কার্যকর হবে।

ইসলামী শরীয়াতের সীমার মধ্যে থেকে অর্থনৈতিক ব্যাপারে শ্রম-সাধনা করার অনুমতি রয়েছে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যেই। প্রত্যেকেই আপন শ্রমের মজুরী লাভ করার অধিকারী। কারও মালিকানা কেউ হস্তগতও করতে পারে না, সে মালিক নারী হোক বা পুরুষ। স্বামীও পারে না নিজ স্ত্রীর মালিকানাধীন ধন-সম্পত্তি হস্তগত করতে; স্ত্রীও পারে না স্বামীর বিত্ত-সম্পত্তি নিজ ইচ্ছামত ব্যয়-ব্যবহার করতে বা উড়াতে।

পুরুষরা যেমন উত্তরাধিকার লাভ করতে পারে, তেমনি নারীর জন্যেও উত্তরাধিকারের অংশ নির্দিষ্ট রয়েছে। তবে বিশেষ কারণে এ ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের অংশ সমান রাখা হয়নি; পুরুষের তুলনায় নারীর অংশ পরিমাণে কম নির্ধারণ করা হয়েছে। এ নিয়ে কিছু স্থূল বুদ্ধির লোক ইসলামের অর্থ-বন্টন রীতির সমালোচনা করতে গিয়ে ঔদ্ধত্য দেখাতে চেয়েছে। কিন্তু ইসলামের পূর্ণাঙ্গ পরিবার ব্যবস্থা বিবেচনা করে দেখলে সম্পূর্ণ ভিন্নতর রূপ প্রতিভাত হয়ে ওঠে। আসলে নারীর কতিপয় স্বভাবগত দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার কারণে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত মজবুত ও নির্ভরযোগ্য করে দেয়া হয়েছে, যদিও পুরুষের আর্থিক অবস্থা সর্বাবস্থায় এবং সর্বক্ষণই অনিশ্চিত, অনির্ভরযোগ্য। ইসলামী বিধান মতে নারীর উত্তরাধিকার অংশ পুরুষের তুলনায় অর্ধেক ধরা হয়। তবে দুটি দিক দিয়ে তার ক্ষতি পূরণ করে দেয়া হয়েছে। স্ত্রী স্বামীর নিকট থেকে মহরানা পায়; পুরুষরা এই ধরনের কিছু কারুর নিকট থেকে পায় না।

এছাড়া বিয়ের সময় বর কনেকে যে অলংকার ও পোশাক-পরিচ্ছদ দেয়, তার মালিকও সে-ই হয় এককভাবে।

এছাড়া গোটা পরিবারের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পরিপূরণের দায়-দায়িত্ব পুরুষদের উপরই ন্যস্ত; নারী তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। মেয়েরা বিয়ের পূর্বে অভিভাবকের এবং বিয়ের পর স্বামীর নিকট থেকে নিশ্চিতভাবে ভরণ-পোষণ পেয়ে থাকে। এরূপ অবস্থায় নারীকে পুরুষের সমান উত্তরাধিকার দান সুবিচার নয়, নিতান্তই অবিচারের নামান্তর। আর ইসলামী সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সর্ব প্রকারের অবিচার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

এই একটি দিক ছাড়া নারী ও পুরুষের মধ্যে আর কোন দিক দিয়েই এতটুকু পার্থক্য রাখা হয়নি।

জীবন ব্যবস্থা ও আইনের অভিন্নতা

প্রাচীন কালের ধর্মসমূহ নারী ও পুরুষকে অভিন্ন মর্যাদা দিতে প্রস্তুত ছিল না। তাতে উভয়ের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন আইন রচিত হয়েছে। প্রত্যেক লিঙ্গের লোকদের জন্যে দেয়া হয়েছে আলাদা-আলাদা জীবন-ব্যবস্থা। কিন্তু ইসলাম নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যে সমানভাবে অনুসরণীয় জীবন-বিধান বিধিবদ্ধ করেছে। কুরআন মজীদে ঘোষিত হয়েছেঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ
لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا *

(الاحزاب : ٣٦)

মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন স্ত্রীলোক যে-ই হোক—আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বা নির্দেশ দিয়ে থাকলে সেই ব্যাপারে এদের কারুরই কোন ইখ্তিয়ার থাকেনা। যে লোকই আল্লাহ্র ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করবে, সে-ই সুস্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত হবে।

এক কথায় বলা যায়, নারী ও পুরুষের জন্যে একই জীবন বিধান বিধিবদ্ধ হয়েছে। কারুর জন্যে স্বতন্ত্র বা ভিন্নতর কোন ব্যবস্থা দেয়া হয়নি ইসলামে। মানুষকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্তও করা হয়নি, যদিও মান-মর্যাদার দিক দিয়ে সাধারণভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে বা স্তরে ভাগ করা হয়েছে মানুষকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও নারী ও পুরুষ উভয়ে একই আদর্শের অনুসারী—একই পথের পথিক। একই জিহাদের মুজাহিদ—যদিও প্রকৃতি ও স্বরূপের দিক দিয়ে নারী ও পুরুষের কর্ম-

ক্ষেত্র এক এ অভিন্ন নয়। কিন্তু ক্ষেত্র ও কর্মের এ পার্থক্য সত্ত্বেও উভয়ের কাজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সর্বোতভাবে এক ও অভিন্ন। ব্যক্তিগত ও খুঁটিনাটি ব্যাপার ছাড়া সামগ্রিক বিষয়াদির যে ক'টি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, তার সংখ্যা মাত্র ৬-৭টি। এগুলোর তাৎপর্য সম্পর্কে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করব।

বৈবাহিক আইন

বস্তুত কুরআন মজীদের দাবি হল, আইনের বইতে, নৈতিকতার বিধানে এবং অধিকারসমূহের তালিকায় নারী ও পুরুষকে অভিন্ন মর্যাদা দিতে হবে। উভয়ের সম্মান-অসম্মানের মানদণ্ড একই হতে হবে। উভয়ের জন্যে উন্নতি, প্রগতি ও সাফল্য লাভের সুযোগ-সুবিধা সম্পূর্ণ সমান থাকতে হবে। উভয়ের জান-মাল ও সম্মান-সম্ভ্রম সমান গুরুত্ব সহকারে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু কেন?

দুনিয়ার আধুনিক সাহিত্যে কুরআন মজীদই সর্বপ্রথম এর দার্শনিক ও বিজ্ঞানসম্মত জবাব দিয়েছে এবং দৃঢ়ভাবে ও অকাট্য যুক্তির ভিত্তিতে বিশ্ব-মানবের সামনে তা পেশ করেছে। বিশ্ব-চিন্তা শত-সহস্র পর্যায় অতিক্রম করার পরও নারী-পুরুষের সাম্য ও অভিন্নতার ব্যাখ্যা এর চাইতে উত্তম ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পেশ করতে সক্ষম হয়নি।

ইসলাম সর্বপ্রথম বিশ্ব-দর্শন পর্যায়ে বলেছে, এই বিশ্বলোক একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনার ভিত্তিতে ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে।–এর প্রতিটি দিক, প্রতিটি বস্তু ও কণা পরম সুসঙ্গতি, নিয়ম-শৃঙ্খলা ও সুসমঞ্জসভাবে প্রতি মুহূর্তে কাজ করে যাচ্ছে। ফলে সহস্র-কোটি বছর পার হয়ে যাওয়ার পরও এই বিশাল রঙ্গমঞ্চের নিত্য-পরিবর্তনশীল সৌন্দর্যে ও মনোহারিতায় বিন্দুমাত্র পার্থক্যও আসেনি। কালের আবর্তন অব্যাহত গতিতে অগ্রসরমান। এর বৈচিত্র্য ও বিস্ময় যথাযথই রয়ে গেছে। কোন্ মহাশক্তি এই বিশ্বলোককে চরম ধ্বংস ও বিলুপ্তির কবল থেকে রক্ষা করছে? কোন্ নিয়ম-বিধান এখানকার মুহূর্ত ও বিন্দুসমূহকে প্রতিনিয়ত দীর্ঘ হতেও দীর্ঘতর ও বিলম্বিত করে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে? এর সদুত্তর একমাত্র কুরআনই দিয়েছে। সে বলেছে, বস্তুলোকে বৈবাহিক নিয়মের কার্যকর অবস্থিতিই তার মূল উৎস। প্রতিটি বস্তুর মধ্যে তার স্ব-প্রজাতির স্থিতি ও টিকে থাকার স্বভাবজাত প্রবণতা প্রকটভাবে বর্তমান। আর এই প্রবণতার পরিতৃপ্তি ও চরিতার্থতার জন্যে তার স্ব-প্রজাতির মধ্য থেকেই বিপরীত লিঙ্গের সৃষ্টি করা হয়েছে। এই বিপরীত লিঙ্গ তার মধ্যে আবেগ-উচ্ছ্বাস ও সংবেদনশীলতা সক্রিয় রেখে তাকেও সক্রিয় করে তুলছে এবং তাকে স্বকীয় অস্তিত্ব বহাল রাখার জন্য

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য করছে। ঠিক এ কারণেই বস্তুলোকে প্রজাতীয় অস্তিত্ব অক্ষুণ্ন ও অব্যাহত থাকা সম্ভবপর হচ্ছে। কুরআন মজীদ ঘোষণা করছেঃ

سُبْحَانَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ مِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ* (يٰس)

মহান পবিত্র সেই সত্তা, যিনি সব ধরণের জোড়া সৃষ্টি করেছেন জমীনের উদ্ভিদগুলির মধ্যেও, এমন বহুসংখ্যক জিনিসের মধ্যেও যাদের তারা জানে না।

وَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ* (الذاريات)

প্রতিটি জিনিসই জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টি করেছি আমরা, যেন তোমরা (সৃষ্টি-রহস্য ও সৃষ্টি নিয়ম) অনুধাবন করতে পার।

বস্তুতঃ বৈবাহিক ও দুই বিপরীত সেক্সের মিলন-রীতি সমগ্র সৃষ্টিলোকে পরিব্যাপ্ত। মানুষ বা অন্য কোন কিছুই এই নিয়মের বাইরে নয়। মানুষের জৈবিক কামনা-বাসনা বিপরীত লিঙ্গের সাথে পূর্ণ মিলন ব্যতীত কোনক্রমেই চরিতার্থ হতে পারে না। পুরুষের জীবনের বহু দিক এমন, যার বিকাশ ও সার্থকতা কেবল নারীর দ্বারাই সম্ভব। নারী হচ্ছে পুরুষের প্রকৃতিগত দাবি ও স্বভাবগত প্রশ্নাবলীর জবাব। এ কারণে নারীকে বলা হয় পুরুষের হৃদয়-বীনার ঝংকার। নারীর জন্যে পুরুষও অনুরূপ অপরিহার্য। তার হৃদয়াবেগের উথাল-পাথাল ও অন্তরের অস্থিরতার চরম প্রশান্তি কেবল পুরুষ দ্বারাই সম্ভব। মহান স্রষ্টার সৃষ্টি নিয়মই এইরূপ যে, এর একটি অপরটির জন্যে পরিপূরক। বিবাহ-ব্যবস্থা তারই জন্যে এক পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক ব্যবস্থা। বস্তুত নারী ও পুরুষ উভয়ে স্বীয় যোগ্যতা-কর্মক্ষমতা ও প্রজাতীয় বৈশিষ্ট্য-বিশেষত্বের প্রকাশ ও বিকাশের জন্যে একটি ক্ষেত্রের মুখাপেক্ষী। বিপরীত লিঙ্গই হচ্ছে সেই ক্ষেত্র। স্বামী-স্ত্রী হিসেবে একত্রিত জীবন যাপন শুরু করলেই নারী ও পুরুষ উভয়ে নিজ নিজ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রটি খুঁজে পেতে পারে। এই প্রয়োজনীয়তা ও পরিপূরকতা নারী-পুরুষে সম্পূর্ণ সমান। কোন পার্থক্যই নেই এখানে। উভয়ই পারস্পরিক নির্ভরতা ও মুখাপেক্ষীতায় আবদ্ধ। কেউই কাউকে বাদ দিয়ে চলতে পারে না। এতে কারুর কোন বিশেষ প্রধান্য নেই—নেই কারুর বিশেষ কোন শ্রেষ্ঠত্ব বা বিশেষত্ব। কুরআন মজীদ নানাভাবে এই সত্যটি প্রকট করে তুলেছে। একটি ঘোষণায় বলা হয়েছেঃ

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ (البقرة)

স্ত্রীলোকেরা–হে পুরুষ–তোমাদের জন্যে ভূষণ স্বরূপ এবং তোমরা পুরুষরাও ভূষণ তাদের জন্যে।

কথাটির তাৎপর্য হচ্ছে, পুরুষদের বহু ক্ষুধা-তৃষ্ণা নারীর দ্বারা নিবৃত্ত হওয়া সম্ভব এবং স্বয়ং নারীর বহু অপূর্ণতাই পুরুষ দ্বারাই পূর্ণতা পেতে পারে। নারী ও পুরুষের এই বৈবাহিক সম্পর্ক হচ্ছে বন্ধুতা-ভালবাসা ও প্রেম-প্রীতির সম্পর্ক। পারস্পরিক শত্রুতা বা হিংসা-বিদ্বেষের কোন অবকাশ নেই এখানে। কুরআন মজীদ ঘোষণা করেছেঃ

وَ مِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّ رَحْمَةً ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

(الروم: ٢١)

আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের একটা বড় নিদর্শন হচ্ছে, তিনি তোমাদের স্বপ্রজাতির মধ্য থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে, যেন তোমরা সেই জুড়ির নিকট মনের প্রশান্তি লাভ করতে পার এবং তিনিই তোমাদের এই জুড়িগুলোর মধ্যে পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার সৃষ্টি করেছেন। বস্তুতঃ এর মধ্যে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে চিন্তা ও গবেষণার বহু নিদর্শন রয়েছে।

এই ভিত্তিগত তত্ত্বগুলোর ওপরই ইসলামী সমাজে নারীর মর্যাদা নির্ণিত ও নির্ধারিত। এ সব ভিত্তিকে বাদ দিয়ে ইসলামী সমাজের কথা কল্পনাও করা যায় না।

নারীর আসল কর্মক্ষেত্র

ইসলামী সমাজে নারীর ভূমিকা কি? তার চেষ্টা-সাধনা কোন্ দিকে ও কোন্ পথে চলবে? কুরআন মজীদ নবী করীম (স)-এর বেগমদের সম্বোধন করে এই প্রশ্নের সুস্পষ্ট জবাব দিয়েছে। ইরশাদ হয়েছেঃ

وَ قَرْنَ فِیْ بُیُوْتِكُنَّ وَ لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الْاُوْلٰی

(الاحزاب: ٣٣)

তোমরা নিজেদের বাসগৃহে শক্তভাবে আসন গ্রহণ করে থাক। পূর্ববর্তী জাহিলী সমাজে স্ত্রীলোকেরা যেরূপ নিজেদের রূপ ও সৌন্দর্য্য প্রকাশ্যভাবে দেখিয়ে বেড়াত, তোমরা তা কস্মিনকালেও করবে না।

আয়াতটির পটভূমি স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স) যখন মদীনায় পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা বাস্তবায়নের সংগ্রামে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তখন দ্বীন-ইসলামের দুশমনরা বিকাশমান মুসলিম সমাজ-ব্যবস্থাকে শক্তিহীন করার জন্যে নানাভাবে চেষ্টা চালাতে লাগল। ইসলাম একদিকে নৈতিক পবিত্রতা-পরিশুদ্ধি ও খোদার প্রতি ঐকান্তিকতা-একাগ্রতার আহবান জানাচ্ছিল। আর কাফির শক্তি সমাজে নানারূপ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে চেষ্টা পাচ্ছিল। এই সময় মুসলিম শক্তি ও কাফির শক্তির মধ্যে যে প্রচন্ড দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের উদ্ভব হয়েছিল, তাতে ইসলাম তার সমাজ-সংস্থাকে সুষ্ঠুরূপে গড়ে তোলার ও মুসলিম ব্যূহকে সুদৃঢ় রাখবার জন্যে সমাজের লোকদের পুনর্বিন্যাস করার তীব্র প্রয়োজন বোধ করে; দেশ ও সমাজের সংরক্ষণে নবতর আইন-বিধান উপস্থাপন করে। তাতে পুরুষ লোকদেরকে সকল প্রকার প্রতি-আক্রমণ ও ফিতনা-ফাসাদের মুকাবিলা করার জন্যে সারিবদ্ধ করা হল এবং নারীদের নির্দেশ দেয়া হল গৃহ-ক্ষেত্রে শক্ত হয়ে সর্বপ্রকার ভাঙন ও বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার। কেননা সমাজের গৃহ-দুর্গই গোটা সমাজের স্থিতির মূল কেন্দ্র। বাইরের মুকাবিলায় পরাজিত হলেও মানুষ গৃহ-দুর্গে আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারে। কিন্তু যে সংগ্রামীদের গৃহ-দুর্গ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং তাতে শত্রু পক্ষের অনুপ্রবেশ ঘটে, সেই সংগ্রামীদের আশ্রয় নেয়ার আর কোন স্থানই অবশিষ্ট থাকে না। এই গৃহ-দুর্গের শক্তিমান রক্ষী হতে পারে সমাজের মহিলারা। তারা এই গৃহ-দুর্গে নিজেদের মান-সম্ভ্রম ও পবিত্রতা অক্ষুন্ন রেখে গোটা সংগ্রামী বাহিনীকে বিরাট সাহায্য দানের নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা করতে পারে।

এই প্রেক্ষিতে দ্বিধা-সংকোচ মুক্ত হয়ে বলা যেতে পারে যে, ইসলাম রাষ্ট্র ও সমাজের সংরক্ষণের দায়িত্ব নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের উপরই অর্পণ করেছে বটে, কিন্তু কার্যতঃ এই দুই লিঙ্গের সংগ্রাম ক্ষেত্র এক ও অভিন্ন রাখেনি। ইসলাম পুরুষদের চালিত করতে চায় অগ্রবর্তী বাহিনীরূপে আর মহিলাদের জন্যে প্রকৃত সংগ্রাম ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করা হয়েছে তাদের গৃহকোণ। উভয়েই নিজ নিজ ক্ষেত্রে পূর্ণ শৃঙ্খলা ও দৃঢ়তা সহকারে দাঁড়িয়ে থেকে কুফরী আদর্শ ও কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাবে। আর সংগ্রাম ক্ষেত্রে প্রতিটি বাহিনীর জন্যে নির্দিষ্ট ফ্রন্টে অবিচল হয়ে থাকার উপরই নির্ভর করে সংগ্রামে বিজয় লাভের সম্ভাবনা। একটি বাহিনীও যদি নিজের নির্দিষ্ট ক্ষেত্র ত্যাগ করে, তা হলে পরাজয়

অবধারিত। এই দৃষ্টিতে উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করলে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা চান, মহিলা সমাজ তাদের গৃহকোণকেই নিজেদের স্থায়ী কর্মক্ষেত্র রূপে গ্রহণ করুক এবং এই ক্ষেত্রটি ত্যাগ করে অপর কোন ক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত ভুল যেন তারা কখনই না করে। অন্যথায় সংগ্রামে শুধু পরাজয়ই বরণ করতে হবে না, চরমভাবে বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে যাবে ইসলামের গোটা সমাজ-প্রাসাদ।

আল্লামা আবু বকর আল-জাস্‌সাস উপরোক্ত আয়াতের আইনগত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেনঃ 'নারী সমাজকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাদের ঘরে স্থিতি গ্রহণের জন্যে এবং ঘর ত্যাগ করে বাইরে বেরিয়ে পড়তে নিষেধ করা হয়েছে তাদের।'

বস্তুতঃ ইসলামী সমাজে নারীর আসল স্থান–প্রকৃত কর্মক্ষেত্র তার ঘর। বৃহত্তর জীবন সাধনার কোন একটি ব্যাপারেও নারীর এই ক্ষেত্র নির্দেশে বিন্দুমাত্র ভুল করা হয়নি। ইবাদাতের অনুষ্ঠান, সামাজিক-সামষ্টিক কার্যাবলী, পরিবার সংস্থা, অর্থনৈতিক কর্ম-তৎপরতা বা রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক ব্যস্ততা–কোন একটি কাজের জন্যেও নারীকে তার ঘর ছেড়ে বাইরে আসতে বলা হয়নি।

ইসলামী ইবাদাতসমূহের মধ্যে নামাযের স্থান সর্বোচ্চে এবং তার গুরুত্ব সর্বাধিক। নামায পড়া ব্যক্তির জন্যে ফরয; কিন্তু তা আদায় করার নিয়ম জামা'আতের সাথে। জামা'আতের সাথে নামায পড়া ইসলামের একটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিধান। কিন্তু নারী সমাজকে এই বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। নারীদের প্রতিও পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয করা হয়েছে, কিন্তু জামা'আতের সাথে পড়া জরুরী ঘোষণা করা হয়নি। রাসূল করীম (স) ঘোষণা করেছেনঃ

خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ (مسند احمد)

গৃহের নিভৃততম কোণই নারীর জন্য উত্তম মজলিস।

জুম'আর নামায মুসলমানদের সাপ্তাহিক ইবাদাত। এই নামায মুসলিম সংহতির বাহ্য রূপ। ব্যক্তিগণ সপ্তাহের এই একটি দিন ব্যাপক ও বিপুল সংখ্যায় একত্রিত হয়ে আল্লাহ্‌র সম্মুখে সিজদায় মাথা লুটায়। নিজেদের সামষ্টিক বিষয়াদি নিয়ে পরস্পর আলোচনা-পর্যালোচনা করে; রাষ্ট্রীয় নির্দেশাদি লাভ করে এই জুম'আর নামাযের সমাবেশে উপস্থিত হয়ে। ইসলামী সমাজ বিধানের দৃষ্টিতে এই নামাযের গুরুত্ব বর্ণনাতীত। কিন্তু তা সত্ত্বেও নারীদের ওপর এই নামায ফরয করা হয়নি, জুম'আর জামা'আতে শামিল হওয়ার কোন বাধ্যবাধকতা তাদের ওপর আরোপিত হয়নি।

জানাজার নামায পড়া ও লাশ দাফনের জন্যে কবরস্থান পর্যন্ত অনুগমন ইসলামী সমাজে সর্বসাধারণের দায়-দায়িত্বের ব্যাপার। কিন্তু সমাজের মহিলাগণকে এই কাজে শরীক হতে বারণ করা হয়েছে।

ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রকে খতম করার উদ্দেশ্যে কুফ্‌রী শক্তি যখন সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন মুসলমানদের কর্তব্য হয় সর্বশক্তি নিয়ে তার মুকাবিলা করা। যুদ্ধ করে শত্রুপক্ষকে প্রতিহত করা। কিন্তু ইসলাম এই দায়িত্ব প্রধানতঃ পুরুষদের ওপরই অর্পণ করেছে, নারীদের ওপর নয়। রাসূলে করীম (স) হযরত আয়েশা (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেনঃ

عَلَيْكُنَّ بِالْبَيْتِ فَإِنَّهُ جِهَادُكُنَّ (مسند احمد)

তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে ঘরে দৃঢ় ও স্থিতিশীল হয়ে থাকা। এ-ই তোমাদের জিহাদ।

জিহাদে শরীক হয়ে পুরুষরা বিজয়ী হলে তারা বিপুল গনিমতের মাল পায়। আর শহীদ হয়ে গেলে আল্লাহ্‌র নিকট পায় মহা সম্মান ও মর্যাদা। কিন্তু মেয়েরা এ কাজে শরীক হতে না পেরে পুরুষদের তুলনায় পিছনে পড়ে থাকে না কি?

প্রশ্নটি খুবই যুক্তিসঙ্গত এবং এ ধরনের প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক। রাসূলে করীম (স)-এর জীবদ্দশায়ই এই প্রশ্ন উঠেছিল এবং তিনিই এর সুস্পষ্ট উত্তর দিয়েছেন। বলেছেন, স্ত্রীলোকেরাও পুরুষদের অনুরূপ সওয়াব ও মর্যাদা লাভ করতে পারে–

طَاعَةُ أَزْوَاجِهِنَّ وَالْمَعْرِفَةُ بِحُقُوقِهِنَّ (الترغيب و الترهيب)

তাদের স্বামীদের আনুগত্য ও তাদের নিজেদের অধিকার জানতে পারলেই।

কিন্তু আল্লাহ্‌র দ্বীনের জন্যে শ্রম, কষ্ট স্বীকার ও ত্যাগ-তিতিক্ষা বরণের আবেগ-উদ্যম নারীদের মনেও জাগতে পারে। ঈমানদার মহিলাদের ব্যাপারে এটা খুবই স্বাভাবিক। ইসলাম এই আবেগ-উদ্যমকে বাস্তবায়িত করার ব্যবস্থা করেছে বটে; কিন্তু শ্রম-সাধনা, চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার ক্ষেত্র পরিবর্তন করে গিয়েছে। নারীরাও কষ্ট স্বীকার করতে পারবে, ঘরের বাইরেও যেতে পারবে; কিন্তু জাতির ভাগ্যের ফয়সালা বা সামাজিক-সামষ্টিক সমস্যার সমাধানের জন্যে নয়, তা করবে আল্লাহ্‌র বন্দেগী কবুল করার ব্যাপারটিকে অধিকতর দৃঢ় করে তোলার উদ্দেশ্যে। রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ

[illegible]

হ্যাঁ, মেয়েলোকদের পক্ষেও জিহাদ করা ফরয, কিন্তু তা এমন জিহাদ যাতে অস্ত্র চালনা বা রক্তপাত ও মারামারি নেই। তা হল হজ্জ ও উমরা করা।

নামাযের জামা'আতে বা জুম'আর নামাযে শরীক হওয়া নারীদের জন্যে সম্পূর্ণ হারাম করে দেয়া হয়নি। তবে একাজ পছন্দ করা হয়নি। এজন্যে ঘরের বাইরে যাওয়ার অনুমতি আছে বটে; কিন্তু ব্যবস্থা এমন গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে করে প্রতি পদে ও প্রতি মুহূর্তে তাদের মনে জাগ্রত থাকে যে, তাদের আসল ক্ষেত্র ঘর–বাইর নয়। মসজিদে নামাযের জামা'আতে মেয়েদের শামিল হওয়ার জন্যে তাদের সারিকে সম্পূর্ণ পিছনে ও ভিন্নতর রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও পুরুষদের সর্বশেষ সারি এবং স্ত্রীলোকদের সর্বপ্রথম সারি–নারী-পুরুষদের নৈকট্যের কারণে বিপজ্জনক ক্ষেত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে পুরুষদের প্রথম দিকে কাতার ও স্ত্রীলোকদের সর্বশেষ কাতার–নারী-পুরুষের মধ্যে দূরত্বের কারণে উত্তম বলা হয়েছে। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে, নারী তার আসল কর্মক্ষেত্র ত্যাগ করে অন্য কোন কাজে লেগে যাবে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (স) অর্থাৎ ইসলাম তা আদৌ পছন্দ করেনি। নারীর জন্যে যে কর্মক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, সেখানেই সে কর্মতৎপর হয়ে থাক, নারীর প্রতি এটাই কাম্য।

সমাজ যদি কোন ব্যক্তিকে তার কোন একটি বিশেষ বিভাগের বা কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে, তাহলে তার অর্থ এই দাঁড়ায় না যে, সে ব্যক্তি সমাজের অন্যান্য বিভাগসমূহ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে; সে অন্যান্য ব্যাপারে কোন কৌতুহল–কোন ঔৎসুক্য পর্যন্ত রাখবে না বা কঠিন প্রয়োজনেও তাতে অংশ গ্রহণ করবার সুযোগ বা অধিকার পাবে না। এভাবে বিশেষ একটি কাজে বা বিশেষ একটি বিভাগের সাথে কাউকে জড়িত করার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, সে তার বেশীর ভাগ সময়, শক্তি ও মনোনিবেশ প্রধানতঃ সেই একটি ব্যাপারেই নিয়োজিত করবে। কেননা সমাজে বিভিন্ন বিভাগ ও কাজ বাহ্যতঃ যতই বিভিন্ন দেখা যাক না কেন, আসলে ও মূলগতভাবে এগুলো আদৌ বিভিন্ন ও পরস্পর-বিচ্ছিন্ন নয়। এগুলো একই সমাজ সংস্থার বিভিন্ন অংশ মাত্র। এগুলোর সমন্বয়েই সমাজ-সংস্থা গড়ে ওঠে। এগুলোর কোন একটি অংশকে বাদ দিলে সমাজ-সংস্থাই তার পূর্ণাঙ্গতা হারিয়ে ফেলবে। এই বিভাগগুলোর কোন একটি নিয়েই সমষ্টি নয়, কোন একটি সমষ্টির সার্বিক চাহিদা পূরণের জন্যে তা কোনক্রমেই যথেষ্ট হতে পারে না। সমাজ-সংস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য এই সবগুলোর নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত থাকা একান্তই জরুরী। এ কথার সত্যতা কোন সমাজতত্ত্ববিদই অস্বীকার করতে পারে না।

ব্যক্তির ক্ষেত্রেও একথা সত্য। কোন ব্যক্তিই জীবনের অসংখ্য জরুরী কাজের মধ্যে কেবল একটি কাজ নিয়ে থাকতে পারে না; থাকলে তার গোটা জীবনই অচল হয়ে যাবে। কেননা ব্যক্তির সামাজিক প্রয়োজন সমাজের বিশাল ক্ষেত্রে বিস্তীর্ণ হয়ে আছে। সমাজের কৃষক, কামার, কুমোর, শিক্ষক-ছাত্র, সরকারী কর্মচারী, রাষ্ট্রের পরিচালক-বিচারপতি, পুলিশ, সৈনিক সকলের ব্যাপারেই এ কথা সত্য। এই দৃষ্টিতেই বলতে হয়, ইসলাম নারীকে ঘরের কাজে নিযুক্ত করেছে বলে তাকে কেবল ঘরের মধ্যেই বন্দী হয়ে থাকতে হবে–ঘরের বাইরের কোন কাজে কিছুমাত্র ঔৎসুক্যও দেখাতে পারবে না, কঠিন প্রয়োজনের সময়ও তাতে কিছুমাত্র অংশ গ্রহণ করতে পারবে না, ইসলামী সমাজ বিধানে এমন কথা বলা হয়নি।

সমাজে ব্যক্তির সাফল্যের শর্তাবলী

ব্যক্তিদের নিয়েই সমাজ। তাই বলে সমাজ-সংস্থায় ও সমাজ জীবনে ব্যক্তি-সত্তা কখনো তুচ্ছ বা বিলীন হয়ে যায় না। ইসলামের দৃষ্টিতে, সমাজে ব্যক্তির

ভূমিকা কোন অংশেই কম গুরুত্বহীন নয়; বরং তাকে সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই পালন করতে হয়।

সমাজে ব্যক্তির সফল ভূমিকা পালনের জন্যে তিনটি শর্ত রয়েছে। প্রথম শর্ত হল, ব্যক্তির নির্ভুল চিন্তা-চেতনা তথা ন্যায়-অন্যায় ও ভাল-মন্দ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ও পার্থক্যবোধ। কেবল ব্যক্তিসত্তার বিকাশের জন্যেই নয়, সমাজের পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্যেও ব্যক্তি সত্তায় এই গুণের অবস্থিতি অপরিহার্য। এ না হলে ব্যক্তি ও সমষ্টির মাঝে পূর্ণমাত্রার সংহতি ও একাত্মতা গড়ে উঠতে পারে না। সমাজের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে ব্যক্তির সুস্পষ্ট ধারণা ও জ্ঞান না থাকলে সে কোন দিনই সমাজের কল্যাণে কোন বিশেষ অবদান রাখতে পারে না।

দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, ব্যক্তির নিজস্ব দৃষ্টিকোণ ও কল্যাণ-কামনার ভিত্তিতে সমাজের জন্যে কাজ করার অবাধ সুযোগ থাকতে হবে। ব্যক্তি যে পথেই অগ্রসর হতে চাইবে, সার্বিকভাবে সমাজের জন্যে অকল্যাণকর না হলে সে পথে তার অগ্রসর হওয়ার অধিকার থাকা আবশ্যক। কেউ যদি তার এ পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, তাহলে সেই প্রতিবন্ধকতা দূর করার মত শক্তি থাকতে হবে সমাজের। নতুবা ব্যক্তির পক্ষে কোন ভূমিকা পালন করাই সম্ভবপর হবে না।

আর তৃতীয় শর্ত হচ্ছে, সমাজ যদি ব্যক্তির নিকট দাবি জানায় সমাজের জন্যে কাজ করার, তাহলে সমাজের কল্যাণে নির্ভুল পন্থায় কাজ করার অধিকার ব্যক্তিকে অবশ্যই দিতে হবে। সমাজস্বার্থের পরিপন্থী কাজ করার অনুমতি না থাকলেও তার কল্যাণে কাজ করার স্বাধীনতা থাকা ব্যক্তি ও সমষ্টি সকলেরই জন্যে জরুরী।

এ তিনটি শর্তের পরিপূরণ সমাজের সার্বিক কল্যাণের জন্যে অপরিহার্য। প্রচলিত গণতান্ত্রিক দৃষ্টিতেও এ শর্তসমূহের অপরিহার্যতা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। এই শর্তগুলো পূরণ হলেই ব্যক্তির পক্ষে সমষ্টির জন্যে কল্যাণকর ভূমিকা পালন করা সম্ভব হতে পারে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই শর্ত তিনটির বিস্তারিত আলোচনার জন্যে তিনটি শিরোনাম দেয়া যায়। তা হলঃ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, কর্মের সুযোগ ও সামাজিক পুনর্গঠন-সংশোধন প্রচেষ্টার স্বাধীনতা।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থা নারী সমাজের ক্ষেত্রে এই তিনটি শর্ত কতটা পূর্ণ করতে সমর্থ, তা বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষ। অতঃপর সেই আলোচনাই শুরু করতে চাই।

ইসলামের আগমনের পূর্বে তদানীন্তন আরব জনগণ সামাজিক বন্ধন ও নিয়ম-শৃঙ্খলামুক্ত স্বাধীন জীবন যাপন করত। সুস্পষ্ট জীবনবোধ বলতে কিছুই ছিল না তাদের। কোন নৈতিক বিধি-বিধান তারা মানতনা। এ পর্যায়ে কোন আলোচনা বা বিতর্কে অংশগ্রহণ করতেও রাযী ছিল না তারা। এ দুনিয়ার জীবনে দৈহিক সুখ-সুবিধা ও আনন্দ-স্ফূর্তি লাভ করাই ছিল তাদের সর্বপ্রকার চেষ্টা-সাধনার একমাত্র লক্ষ্য। এই বৈষয়িক জীবনের অন্তরালে অপর কোন জগত এবং এই বস্তুজীবনের পর কোন বস্তু-উর্ধ্ব জীবনের কল্পনা করাও ছিল তাদের সাধ্যাতীত। এই অবস্থায় ইসলাম তাদের সামনে আধ্যাত্মিক ও আদর্শভিত্তিক জীবনের এক সুস্পষ্ট চিত্র ও পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা উপস্থিত করে। এতে ছিল একটা পূর্ণাঙ্গ নৈতিক বিধি-বিধান। তাতে হালাল ও হারামের একটা তালিকাও ছিল। সওয়াব ও আযাব এবং জান্নাত ও জাহান্নামের কথাও বলা হয়েছিল স্পষ্ট ভাষায়। আর এই সবের ভিত্তি হিসেবে পেশ করা হয়েছিল আল্লাহ্‌র একত্ব, রাসূলের নবুয়্যাত-রিসালাত ও পরকালের বিশ্বাস স্থাপনের হৃদয়-স্পর্শী আহ্বান। আরবের লোকেরা যখন ধীরে ধীরে এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে শুরু করে, তখন ইসলামের ভিত্তিতে একটা সমাজ গড়ে উঠে। এই সময় কুরআন মজীদের নিম্নোদ্ধৃত ঘোষণাটি নাজিল হয়। এই ঘোষণার বক্তব্য ছিলঃ কোন নারী যদি ইসলামী সমাজ-সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হতে ইচ্ছা করে, তাহলে তাকে কতকগুলো বিষয়ে স্পষ্ট ভাষায় অঙ্গীকার বা শপথ করতে হবে। ঘোষণাটি এইঃ

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ
بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ
وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا
يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (الممتحنة: ١٢)

হে নবী। মু'মিন স্ত্রীলোকেরা যখন তোমার নিকট বয়'আত গ্রহণের জন্য আসে এসব বিষয়ে যে, তারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে একবিন্দু শির্‌ক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তান হত্যা করবে না, জেনে-শুনে কারুর ওপর মিথ্যা দোষারোপ করবে না, ভাল কাজে তোমার অবাধ্যতা করবে না, তখন তুমি তাদের বয়'আত গ্রহণ কর এবং তাদের জন্যে আল্লাহ্‌র নিকট মাগফিরাত চাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

এ আয়াতে দ্বীনের যে কটি মৌলিক বিষয়ে শপথ নেয়ার জন্যে রাসূলে করীম (স)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা কেবল নারীদেরই ব্যাপার নয়; তা পুরাপুরি পুরুষদের জন্যও প্রযোজ্য। কেননা পারিবারিক বিষয়াদির সাথে তাদের যা সম্পর্ক, তার চাইতে অনেক বেশী সম্পর্ক বাইরের জীবনের বিষয়াদির সাথে। এ-ও জানা গেল যে, দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদি পরিপুরনের দায়িত্ব যতটা পুরুষের, স্ত্রীলোকদের দায়িত্ব তার চাইতে কিছুমাত্র কম নয়। জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কার কি দায়িত্ব ও কর্তব্য, তা যেমন পুরুষদের জানা দরকার, তেমনি স্ত্রীলোকদেরও। "কোন ভাল ও মঙ্গলজনক কাজেই রাসূলের অবাধ্যতা বা নাফরমানী করা হবে না" কথাটি ছোট্ট হলেও সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলার বিচারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অঙ্গীকার মানুষকে দায়িত্বশীল বানিয়ে রাখে এবং সামাজিক ক্ষেত্রে রাসূলের প্রবর্তিত আদর্শের পরিপন্থী যে কোন কাজের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্যে এটি মানুষকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও কৃতসংকল্প বানিয়ে দেয়। ফলে নারী সমাজকেও দ্বীনের সংরক্ষণ ও দ্বীন-ভিত্তিক সমাজ-শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে সংগ্রামী করে তোলে। রাসূলে করীম (স)-এর জীবদ্দশায়ই এর বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছিল। দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ বিধান সম্পর্কে ব্যাপক ও গভীর জ্ঞান লাভের জন্যে তখন মহিলা সাহাবীরা অত্যন্ত তৎপর হয়ে ওঠেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেছেনঃ "মেয়েরা দ্বীন সম্পর্কিত জ্ঞানার্জনের জন্যে এতই তৎপর হয়ে উঠেছিল যে, এ পথে তারা কোনরূপ লাজ-লজ্জারও পরোয়া করত না।" (মুসলিম) হযরত আয়েশা (রা) এও বলেছেনঃ "নবী করীম (স)-এর সময়ে কোন আয়াত নাজিল হলে তাতে বর্ণিত হালাল-হারাম ও আদেশ-নিষেধসমূহ সঙ্গে সঙ্গেই আমরা আয়ত্ত করে নিতাম, তার কেবল শব্দগুলো মুখস্থ করে ক্ষান্ত হতাম না।" (আল্-ইকদুল ফরীদ)

জুম্'আ ও ঈদের নামাযে শরীক হওয়ার জন্যে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসা স্ত্রীলোকদের জন্যে জরুরী করা হয়নি বটে; কিন্তু তাতে যে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেয়া হয়, তা শ্রবণ ও তা থেকে উপকৃত হওয়ার জন্যে সুযোগ গ্রহণ নারীদেরও কর্তব্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। —বুখারী

রাসূলে করীম (স)-এর সময়ে জ্ঞান-চর্চার যেসব মজলিস অনুষ্ঠিত হত, মহিলারা সেসবের অদূরে পর্দার অন্তরালে উপস্থিত থেকে তা থেকে যথেষ্ট উপকার লাভ করতেন। তাঁরা রাসূল (স)-এর ভাষণ শুনবার জন্যে স্বতন্ত্রভাবে একত্রিত হতেন। শুধু চিত্তবিনোদনের জন্যে নয়, ইসলাম সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনই ছিল এসব শিক্ষা সমাবেশে তাঁদের উপস্থিতির মুখ্য উদ্দেশ্য। অনেক মহিলা এমনও ছিলেন, যাঁরা রাসূলের মুখে কুরআন পাঠ শুনেই তা মুখস্ত করে

ফেলতেন। রাসূলে করীম (স) নিজেও মহিলাদের দ্বীন-ইসলাম শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ চিন্তা-বিবেচনা করতেন ও সেজন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। কোন সময় যদি তিনি মনে করতেন যে, মহিলারা তাঁর কোন কথা ঠিকমত শুনতে পারেনি, তাহলে তাদের নিকটে উপস্থিত হয়ে সেকথার পুনরাবৃত্তি করতেন। বস্তুতঃ সমাজের পুরুষদের ন্যায় মহিলাদেরও যে দ্বীন সম্পর্কে সুশিক্ষিত করে তোলার ব্যবস্থা করা সমাজ প্রধানের দায়িত্ব, তাতে সামান্যতম সন্দেহ নেই। তাই সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা মহিলাদের শিক্ষার জন্যে যথেষ্ট মনে না হলে রাসূলে করীম (স) তাদের জন্যে অনেক সময় স্বতন্ত্র ব্যবস্থাও গ্রহণ করতেন। মহিলারাই একবার রাসূলে করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে দাবি জানালেন এই বলে যে, "আপনার দরবারে সব সময় কেবল পুরুষদের ভিড় জমে থাকে, আমরা আপনার নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণের কোন সুযোগ পাই না। কাজেই আমাদের শিক্ষা দানের জন্যে ভিন্নতর ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।" তাদের দাবি অনুযায়ী তিনি তা-ই করেছিলেন। মদীনার আনসার গোত্রের মহিলাদেরকে একটি ঘরে একত্রিত করে তাদের দ্বীন শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে সেখানে তিনি হযরত উমর ফারুক (রা)-কে পাঠিয়েছিলেন। তিনি ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে মহিলাদের লক্ষ্য করে ভাষণ দিয়েছিলেন।

অন্য কথায়, মহিলাদের জন্যেও শিক্ষা অপরিহায্য এবং প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা সমাজ তথা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। কিন্তু এই শিক্ষার জন্যে নারীদের শালীনতা বিরোধী কোন পরিবেশ বা পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দেয়া কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় হতে পারে না। শিক্ষনীয় বিষয়বস্তু ও পাঠ্য-পুস্তকেও নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য হওয়া আবশ্যক। সে ক্ষেত্রেও নারী-পুরুষের অবাধ সংমিশ্রণ সম্পূর্ণ পরিহার্য।

স্ত্রীলোকদের শিক্ষা-প্রশিক্ষণ লাভের সঠিক ও উপযুক্ত ক্ষেত্র হচ্ছে তাদের ঘর–পারিবারিক পরিবেশ। এই কারণে তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব প্রথমতঃ পিতা-মাতা ও স্বামীর উপর অর্পণ করা হয়েছে। রাসূলে করীম (স)-এর এ পর্যায়ের একটি নির্দেশের ভাষা এইঃ

اِرْجِعُوا اِلَى اَهْلِيكُمْ فَاَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ (بخارى)

তোমরা তোমাদের পরিবারবর্গের নিকট চলে যাও, তাদের মধ্যে বসবাস কর, তাদের জ্ঞান শিক্ষা দাও এবং তদনুযায়ী আমল করার জন্যে তাদের আদেশ কর।

কুরআনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিশেষভাবে ঘরের মহিলাদের শিক্ষা দেয়ার জন্যে নবী করীম (স) পুরুষদের নির্দেশ দিয়েছেন। ইসলামী সমাজের মহিলারা

দ্বীন সম্পর্কে জরুরী জ্ঞান লাভ করুক. রাসূলে করীম (স)-এর এ-ই ছিল বাসনা এবং চেষ্টা। কেবল নীতিগত জ্ঞান শিক্ষা দেয়াই লক্ষ্য ছিল না. সেই সঙ্গে বিভিন্ন কারিগরি জ্ঞান শিক্ষা দেয়াও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর এজন্যে কেবল উপদেশ দিয়েই তিনি ক্ষান্ত থাকেন নি, আইনগত ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছিলেন। পিতা-মাতা বা স্বামী যদি পারিবারিক পরিবেশে জরুরী দ্বীনী শিক্ষা দানের ব্যবস্থা না করে, তাহলে ঘরের বাইরে গিয়েও সেই জ্ঞান লাভ করার সুযোগ মহিলাদের দিতে হবে। এই হচ্ছে ইসলামী আইনের বিধান। দ্বীনী জ্ঞান অর্জণের জন্যে নারীকে সুযোগ-সুবিধা দিতে গোটা সমাজই দায়িত্বশীল। এই পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা থাকলে তা দূর করতে হবে সমাজকেই। শুধু কিতাবী বিদ্যাই নারীদের জন্যে যথেষ্ট নয়. তাদের চিন্তা শক্তির উৎকর্ষ সাধন এবং অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে নব নব সত্য ও তত্ত্ব উদঘাটনের জন্যে তাদের মানসিক শক্তির বিকাশ সাধনের ব্যবস্থা করাও ইসলামী সমাজের কর্তব্য।

কর্মক্ষেত্রে নারী

নারী সমাজের কর্মতৎপরতা কেবলমাত্র বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞান অর্জন ও চিন্তা-গবেষণার ক্ষেত্র পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে, ইসলাম এমন কথা বলেনি। বাস্তব কাজে যথার্থ ভূমিকা পালনের জন্যেও ইসলাম এক বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র তাদের জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা লাভে অগ্রসর হতে পারে, তেমনি কৃষি ও ব্যবসায়ের কাজে অংশগ্রহণ করারও তারা সম্পূর্ণ অধিকারী। জীবিকার জন্যে বিভিন্ন কাজ কারবার, শিল্প কারখানা স্থাপন, পরিচালন বা তাতে কাজ-করারও অধিকার রয়েছে নারীদের। সেই সঙ্গে সমাজ ও জাতির বহুবিধ সামষ্টিক কাজ আঞ্জাম দেয়াও তাদের জন্যে কিছুমাত্র নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, নারীদের এসব কাজে অবশ্যই নেমে যেতে হবে এবং এসব করা তাদের জন্যে একান্তই জরুরী করে দেয়া হবে। বস্তুত অনুমতি এক কথা আর বাস্তবে তা চর্চা করা একান্তই জরুরী হওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। নারীরা এ সব কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ুক. ইসলামে তা কাম্য নয়। নারীদের মধ্যেও এ ধরণের কাজে অংশগ্রহণের আগ্রহ-উৎসাহ থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে কাউকে নিরুৎসাহিত করা ইসলামের রীতি নয়। সে উৎসাহ-উদ্দীপনা নির্মূল করতে চেষ্টাও করেনি ইসলাম। বরং তার বাস্তব চরিতার্থতার অনুমতিটুকু দিয়ে রাখা হয়েছে মাত্র। তার অর্থ, একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়লে নারী এই অনুমতির সুযোগ গ্রহণ করতে পারে অকুণ্ঠ চিত্তে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। রাসূলে করীম (স) একবার জিহাদে গমনকারী লোকদেরকে সামুদ্রিক সফর করার বিরাট সওয়াব ও মর্যাদার কথা বললে উম্মে হারাম নাম্নী এক মহিলা সাহাবী বললেনঃ 'হে রাসূল, দোয়া করুন, আমিও যেন এই জিহাদী সফরে শরীক হতে পারি। রাসূলে করীম (স) তা-ই করলেন। অথচ এটা জানা কথা যে, জিহাদে গমন নারীদের জন্যে ফরয করা হয়নি ইসলামে। এ থেকে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার মেজাজ-প্রকৃতি স্পষ্টত ফুটে ওঠে। সামাজিক-সামষ্টিক কাজ থেকে নারীরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকুক কিংবা তার প্রতি তাদের কোন কৌতূহল ও আগ্রহ উৎসাহ থাকবে না, তা ইসলামে আদৌ কাম্য নয়। তাদের জন্যে স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রের মধ্যেই তাদেরকে চিরজীবন সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে, তার বাইরে তারা উঁকি মেরেও তাকাবে না, ইসলামে তা-ও কোন পছন্দনীয় ব্যাপার নয়। কিন্তু সামাজিক-সামষ্টিক কাজ-কর্মে কর্মীদের যে সব মৌলিক গুণ ও যোগ্যতা-ক্ষমতা স্বভাবতই থাকা দরকার, নারীদের তা খুব কমই থাকে বলে স্বভাবসম্মত জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম নারীদের ওপর এই কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়নি। এই পর্যায়ের গুণ-বৈশিষ্ট, যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় বিরোধী শক্তির সাথে নিরন্তর দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামে লিপ্ত থাকার মাধ্যমে। কিন্তু নারীদের পক্ষে নিজেদের স্বাভাবিক দায়-দায়িত্ব পালন করার সঙ্গে সঙ্গে এই দ্বন্দ্ব-সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ খুব বেশী হওয়া কিছুমাত্র স্বাভাবিক নয়। এই কারণে তাদের পক্ষে সামাজিক-সামষ্টিক কার্যাবলীতে কার্যত অংশগ্রহণ পছন্দ করা হয়নি। পছন্দ করা হয়নি এ কারণেও যে, নারীরা যদি তা-ই করতে যায়, তাহলে পারিবারিক দায়িত্ব, সন্তান গর্ভধারণ, প্রসব ও শিশু লালন-পালন তথা মত মানব বংশের ধারা অব্যাহত রাখার পক্ষে একান্তই জরুরী কার্যাবলী সম্পূর্ণ ব্যাহত হবে; তা থাকবে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত ও অবহেলিত, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। সেই সঙ্গে পারিবারিক জীবনের সব সুখ-শান্তি, বিশ্বস্ততা, পবিত্রতাও নিঃসন্দেহে ক্ষুণ্ন হবে এতে। এই কারণে—নারীদেরকে কঠিন অশান্তি ও দুঃখ-দুর্দশা থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই তাদেরকে শান্তিপূর্ণ ঘর-সংসার থেকে টেনে বাইরে নিয়ে এসে দুঃসহ অবস্থার সম্মুখীন করে দেয়াকে ইসলাম সমর্থন করেনি। তাই বলছিলাম, বাইরের কাজে-কর্মে অংশগ্রহণ করতে নারীদের নিষেধ করা না হলেও—বরং তার অনুমতি দেয়া সত্ত্বেও—সাধারণভাবে তাদের জন্যে তা পছন্দ করা হয়নি। তবে তার অর্থ এ-ও নয় যে, নারীরা ঘরের বাইরে কখনই যাবে না এবং বাইরের দরকারী কাজও তারা করবে না।

একজন মহিলা সাহাবী তালাকপ্রাপ্তা হয়ে ইদ্দত পালনকালে ঘরের বাইরে গিয়ে নিজের বাগানের খেজুর গাছের ডাল কেটে বিক্রী করার অনুমতি চাইলে রাসূলে করীম (স) জবাবে বললেনঃ

اُخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ لَعَلَّكِ اَنْ تَصَدَّقِي مِنْهُ اَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا ـ (ابو داؤد)

ক্ষেতে যাও, অতঃপর নিজের খেজুর গাছ কাট (আর বিক্রী কর)। এই টাকা দ্বারা সম্ভবত তুমি দান-খয়রাত অথবা অন্য কোন ভাল কাজ করতে পারবে। (আর এভাবে তা তোমার পরকালীন কল্যাণ লাভেরও নিমিত্ত হবে।)

একথা বলে নবী করীম (স) হযরত জাবির (রা)-এর খালাম্মাকে মানবতার কল্যাণমূলক কাজ করার জন্যে উৎসাহ দিলেন। এর তাৎপর্য হল, ইসলামী শরীয়াত নারী সমাজকেও মানবতার খেদমত ও কল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত দেখতে চায়। কিন্তু তাতে যেন কখনই সীমা লংঘিত না হয়, সেদিকে ইসলামের সতর্কতা কারুরই অজানা নয়।

ঘরের বাইরে কর্মতৎপরতা

উপরোদ্ধৃত হাদীসটি থেকে এও জানা যায়, সৎ ও কল্যাণমূলক কাজের উদ্দেশ্যে নারীরা ঘরের বাইরে যেতে পারে। প্রাথমিক কালের মুসলিম মহিলারা প্রয়োজনের তাগিদে ঘরের বাইরে, হাটে-বাজারে ও ক্ষেতে-খামারেও চলে যেতেন। এই ব্যাপারে বিশেষ ধরনের কোন নিষেধ ছিল না।

পর্দার বিধান নাজিল হওয়ার পর হযরত উমর (রা) হযরত সওদা (রা)-কে ঘরের বাইরে দেখতে পেয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। হযরত সওদা এই ব্যাপারটি নবী করীম (স)-এর নিকট প্রকাশ করেন। কিছুক্ষণ পরই নবী করীম (স)-এর প্রতি অহী নাজিল হয়। তখন তিনি হযরত সওদা (রা)-কে ডেকে বললেনঃ

اِنَّهُ اُذِنَ لَكُنَّ اَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ ـ (بخارى ـ مسند احمد)

হ্যাঁ, প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাওয়ার অনুমতি তোমাদের জন্যে রয়েছে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

রাসূলের সময়কার মুসলিম মহিলাদের কর্মতৎপরতা দেখে একথা বলিষ্ঠভাবেই বলা যেতে পারে যে, মুসলিম মহিলারা কাজের প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে পারেন। ইসলামী সমাজে এ ব্যাপারে কোন প্রতিবন্ধকতার অবকাশ নেই। প্রাথমিক যুগের ইসলামী সমাজে মহিলারা চাষাবাদের কাজও করতেন,

গৃহপালিত জন্তু পালনের কাজও করতেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর কন্যা হযরত আস্‌মা (রা) ছিলেন হযরত জুবাইর (রা)-এর স্ত্রী। তিনি নিজেই তাঁর ঘোড়াকে খাবার দিতেন, পানি পান করাতেন। এছাড়া ঘরের যাবতীয় কাজও তাঁকেই করতে হত। তিনি নিজে বাড়ী থেকে দুই মাইল দূরে অবস্থিত জমি থেকে খেজুর বীজ তুলে আনতেন। যাতায়াতের পথে রাসূলে করীম (স)-এর সাথে মুখোমুখি হয়ে যেতেন অনেক সময়। কীলাহ্‌ নাম্নী এক মহিলা রাসূলে করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেনঃ إِنِّي امْرَأَةٌ أَبِيعُ وَاَشْتَرِيْ 'আমি একজন স্ত্রীলোক। আমি ক্রয়-বিক্রয়–অর্থাৎ ব্যবসায় করি'। পরে সে মহিলা রাসূলে করীম (স)-এর নিকট ব্যবসায় সংক্রান্ত কয়েকটি মাসলাও জিজ্ঞেস করেন। হযরত উমর (রা)-এর খিলাফত আমলে হযরত আস্‌মা বিনতে মুহাররমা (রা) নাম্নী এক মহিলা সাহাবী আতরের ব্যবসায় করতেন। (طبقات ابن سعد) উমরা বিন তবীযা (রা) একজন দাসী সমভিব্যহারে বাজারে গিয়ে বড় আকারের একটি মাছ ক্রয় করে বাড়ি ফিরে আসছিলেন। পথিমধ্যে হযরত আলী (রা) তাঁকে দেখে জিজ্ঞেস করলেনঃ 'কত দিয়ে কিনলে? মাছটা তো বেশ বড়। ঘরের সকলেই পেট ভরে খেতে পারবে'। (طبقات ابن سعد)

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রা)-এর বেগম নিজে ঘরে বসে শিল্পকর্ম করতেন এবং তা বিক্রী করে ঘর-সংসারের খরচাদি চালাতেন। একদিন তিনি নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেনঃ

إِنِّيْ إِمْرَأَةٌ ذَاتَ صَنْعَةٍ أَبِيعُ مِنْهَا وَ لَيْسَ لِيْ وَ لَا لِزَوْجِيْ وَ لَا لِوَلَدِيْ شَيْءٌ. (طبقات ابن سعد)

আমি একজন কারিগর মেয়েলোক। আমি তৈরী করা দ্রব্য বিক্রী করি। এছাড়া আমার, আমার স্বামীর এবং আমার সন্তানদের জীবিকার অন্য কোন উপায় নেই।

রাসূলে করীম (স) বললেনঃ 'এভাবে উপার্জন করে তুমি তোমার ঘর-সংসারের প্রয়োজন পুরণ করছ। এতে তুমি বিরাট সওয়াবের অধিকারী হবে।'

এ আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উপার্জনের জন্য কাজ করা ও সে জন্যে ঘরের বাইরে যাওয়া নারীদের জন্যে নিষিদ্ধ নয়। তবে তা যে সীমার মধ্যে থেকে করতে হবে এবং তাতে নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশার ও বন্ধুতা-সখ্যতা করার সুযোগ থাকা চলবে না, একথা খুলে বলার প্রয়োজন পড়ে না।

অধিকার সংরক্ষণ

ইসলামী সমাজে নারীদের যে সব অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়েছে, রাসূলের প্রতিষ্ঠিত সমাজে তা তারা পুরাপুরি ভোগ করেছে। কোথাও তাদের এ অধিকার খর্ব করা হলে কিংবা তাদের ওপর কোনরূপ অবিচার করা হলে তারা তার প্রতিকারের জন্যে পূর্ণ বিচক্ষণতা সহকারে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়েছে। ইসলামী আইন-বিধান সেসব ক্ষেত্রে তাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে সর্বতোভাবে সফল করার ব্যাপারে পূর্ণ সহায়তা ও সহযোগিতা দিয়েছে।

একটি মেয়েকে তার পিতা আপন ধনাঢ্য ভ্রাতুষ্পুত্রের সাথে বিবাহ দিয়েছিল। কিন্তু কনে বরকে একেবারেই পছন্দ করেনি। মেয়েটি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট এ বিষয়ে অভিযোগ তুললে তিনি বললেনঃ 'এই বিবাহ রক্ষা করা না-করা তোমার ইচ্ছাধীন।' মেয়েটি বললঃ বাবার দেয়া বিবাহ আমি খতম করব না বটে; তবে আমি জানিয়ে দিতে চাই যে, মেয়েদের ইচ্ছা ও পছন্দের বিপরীত তাদের বিয়ে দেয়ার কোন অধিকারই তাদের পিতাদের নেই।

বুরাইরা নাম্নী একজন ক্রীতদাসীর বিয়ে হয়েছিল মুগীস নামক এক ক্রীতদাসের সাথে। কিছুদিন পর বুরাইরা দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে। তখন সে মুগীসের স্ত্রীত্বাধীন থাকতে অস্বীকৃতি জানায়। এই অস্বীকৃতি ছিল শরীয়াতের শাশ্বত বিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এই অস্বীকৃতির কথা জানতে পেরে মুগীস দুঃখ ও বেদনায় আর্তনাদ করে ওঠে। সে বুরাইরার পিছনে পিছনে দৌড়াতে থাকে এবং তাকে অনুরোধ করতে থাকে তার এই অস্বীকৃতি প্রত্যাহার করার জন্য। রাসূলে করীম (স) এই দৃশ্য দেখে সহানুভূতির ভারে বিষন্ন হয়ে উঠেন এবং বুরাইরাকে পুনর্বিবেচনা করতে বলেন। বুরাইরা বললঃ এটা কি আপনার আদেশ? জবাবে তিনি বললেনঃ না, আদেশ নয়, কেননা এ ব্যাপারে আদেশ করার কোন অধিকার আমার নেই। তবে আমি মুগীসের জন্যে তোমার নিকট সুপারিশ করছি। নবীর সুপারিশ এবং নির্দেশে মৌলিকভাবে কোন পার্থক্য নেই জেনেও বুরাইরা বললঃ 'না, ওর কাছে আমার কোনই প্রয়োজন নেই।'

বুরাইরার এই অনমনীয়তার মূলে ছিল এই বিশ্বাস যে, ইসলামী শরীয়াত নারী সমাজকে যে অধিকার দিয়েছে, সে অধিকার ভোগ করার জন্যে আইনের আনুকূল্যও সে লাভ করবে। এই কারণে সে সম্পূর্ণ নির্ভীকভাবে স্বীয় সিদ্ধান্তে অবিচল থাকল। শরীয়াত এ ব্যাপারে নির্বাক হয়ে গেল।−বুখারী, আবূ দাউদ

রাসূলে করীম (স)-এর জীবনকালে মুসলিম মহিলারা মসজিদে হাজির হয়ে জামা'আতের সাথে নামায পড়তেন। অবশ্য হযরত উমর ফারুক (রা) নিজে

মেয়েদের মসজিদে উপস্থিত হওয়া পছন্দ করতেন না। তাঁর বেগম আতিকা (রা)ও নিয়মিত মসজিদে নামায পড়তে যেতেন। একদিন হযরত উমর (রা) তাঁকে বললেনঃ 'তুমি জান যে, তোমার মসজিদে যাওয়া আমি পছন্দ করি না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তুমি কেন বিরত থাকছ না?' জবাবে তিনি বললেনঃ 'খোদার শপথ, আপনি আমাকে স্পষ্টভাষায় নিষেধ না করা পর্যন্ত আমি বিরত থাকব না।' বাস্তবিকই তিনি বিরত থাকেন নি। এমন কি, হযরত উমর (রা) মসজিদে আততায়ীর অস্ত্রাঘাতে যখন শহীদ হয়েছিলেন, তখনও তিনি মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। –বুখারী

অন্যকথায়, স্বামী হিসেবে হযরত উমর (রা) নিজের স্ত্রীকে মসজিদে যাওয়া থেকে নিষেধ করতে পারতেন এবং সে নিষেধ তিনি মেনে নিতে বাধ্য হতেন। কিন্তু শরীয়াত যেহেতু সাধারণভাবেই মহিলাদের এই অধিকার দিয়েছে, তাই সে অধিকার ভোগ করারও পূর্ণ স্বাধীনতা তাঁর রয়েছে। স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধানও তা থেকে তাকে বঞ্চিত করতে পারে না।

সামষ্টিক স্বার্থরক্ষার জন্য চেষ্টা

উপরোক্ত ঘটনাবলী এ কথা প্রমাণ করছে যে, ইসলামী সমাজে নারী শরীয়াত-প্রদত্ত সব অধিকার অবাধে, নিরুপদ্রপভাবেই ভোগ করার সুযোগ পেয়ে থাকে। ইসলামী সমাজই এ অধিকারের সংরক্ষক। প্রাথমিক কালে যেমন সে অধিকার পেতে তাদের কোন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়নি, তেমনি হতে হবে না একালের প্রকৃত ইসলামী আদর্শে গঠিত কোন সমাজেও।

সমাজ গঠনে নারীর ভূমিকা

ইসলামী সমাজ গঠনে নারী সমাজের বিরাট অবদান রয়েছে। এ জন্যে তাঁরা বহু দুঃখ-কষ্ট ও ত্যাগ-তিতিক্ষা বরণ করতেও কুণ্ঠিত হননি। নিকটাত্মীয়তা ও রক্তের সম্পর্কও এ জন্যে ছিন্ন করতে তাঁরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি। এমন কি আপন ঘর-বাড়ি ত্যাগ করে চলে যেতে কিংবা বহিষ্কৃত হতেও কিছুমাত্র দুর্বলতা বা কাতরতা প্রদর্শন করেননি। মোটকথা এ পথে যত বাধাই এসেছে, সবকিছু তাঁরা দুপায়ে দলে গেছেন।

মক্কার প্রাথমিক পর্যায়ে যে সব ভাগ্যবতী মহিলা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের নির্যাতন ভোগ করার রক্তাক্ত কাহিনী ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে। হযরত আম্মার (রা)-এর জননী ছিলেন একজন ঈমানদার মহিলা। তিনি ছিলেন আবূ হুযাইফা ইবনে মুগিরার ক্রীতদাসী। দ্বীন-ইসলাম থেকে তাঁকে বিরত রাখা ও কবুল-করা দ্বীন ত্যাগে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে তাঁর ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। নর-পিশাচ আবু জেহেল বল্লমের আঘাতে-আঘাতে তাঁকে শহীদ করে ফেলে। ইসলামী সংগ্রামে এই ছিল ইতিহাসের প্রথম আত্মদান-প্রথম শাহাদাত বরণ। (তাবাকাতে ইবনে সায়াদ)

হযরত উমর (রা)-এর বোন হযরত ফাতিমা বিনতে খাত্তাব ঈমান গ্রহণের পর তাঁর আপন সহোদর ভাই উমর কর্তৃক এমনভাবে প্রহৃত হন যে, তাঁর সমস্ত দেহ রক্তাপ্লুত হয়ে পড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি একবিন্দু বিচলিত হননি; বরং তিনি যে দ্বীন–যে কালামের প্রতি ঈমান এনেছিলেন, ভাইকে সে বিষয়ে অবহিত করে শেষ পর্যন্ত তাঁকেও ঈমান আনতে বাধ্য করেছিলেন।

আবূ সুফিয়ান ঈমান আনার পূর্বে মদীনায় রাসূলে করীম (স)-এর ঘরে উপস্থিত হয়ে রাসূলের সজ্জিত বিছানায় আসন গ্রহণ করতে গিয়ে তারই কন্যা উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রা) কর্তৃক অপমানিত হয়েছিল। পিতা ক্ষুব্ধ হয়ে কন্যাকে জিজ্ঞেস করলঃ 'আমাকে কি এই শয্যার ওপর আসন গ্রহণেরও অনুপযুক্ত মনে কর?' কন্যা স্পষ্ট কথায় জবাব দিলেনঃ 'হ্যা, এটা আল্লাহ্‌র রাসূলের বিছানা। একজন মুশরিককে এর ওপর বসতে দিয়ে এর পবিত্রতা নষ্ট হতে দিতে আমি প্রস্তুত নই'।

আবূ সাইফীর (রা) কন্যা রকীকা মক্কার সেই সংকটজনক পরিস্থিতিতেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কুরাইশরা নবী করীম (স)-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র

করলে তিনিই পূর্বাহ্নে এ বিষয়ে তাঁকে অবহিত করেছিলেন নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে।

উত্তরকালে এ ঈমানদার মহিলারা দ্বীনের ব্যাপারে কাউকে ক্ষমা করেন নি। আপন গর্ভজাতও যদি দ্বীনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকে কিংবা দ্বীনের একবিন্দু ক্ষতি সাধনে উদ্যোগী হয়ে থাকে, তাহলে তার প্রতিও তাঁরা চরমভাবে কঠোর হয়েছেন এবং কোনরূপ খাতির করতে বা দুর্বলতা দেখাতে প্রস্তুত হননি।

যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলিম মহিলা

প্রসঙ্গত একটি কথা সকলেরই মনে রাখা আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'আলা নারী ও পুরুষ সৃষ্টি করে সামাজিক-সামষ্টিক কাজের দায়িত্ব উভয়ের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছেন। আর এই কর্ম-বন্টনে রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার কোন দায়িত্ব প্রত্যক্ষভাবে নারীদের ওপর অর্পণ করা হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও খোদার দ্বীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা-প্রচেষ্টার ব্যাপারে ঈমানদার নারী সমাজ কোনক্রমেই নিষ্ক্রিয় বা নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকতে পারে না। আর এই কারণে তারাও ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে প্রস্তুত হয়েছেন। কেননা কুফরীর ঝাণ্ডা অবনমিত ও পদদলিত করে ইসলামের বিজয় পতাকা উড়ানোর কামনা-বাসনা তাদের হৃদয়-মনে জাগ্রত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাই ইসলামের বিজয়-ইতিহাসের সোনালী পৃষ্ঠায় পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে নারীদেরও বিরাট কীর্তিকলাপের উল্লেখ পাওয়া যায়।

উম্মে আম্মারা (রা) ছিলেন একজন মহিলা সাহাবী। ওহোদের যুদ্ধে যোগদান করে তিনি পুরুষদের মতই অতুলনীয় বীরত্ব, দুর্দমনীয় সাহসিকতা ও অসাধারণ দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি ভোরবেলা শয্যা ত্যাগ করে উঠে যেতেন এবং মুজাহিদদের খেদমত করার উদ্দেশ্যে সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হতেন। এই যুদ্ধের প্রথম দিকে মুসলিম বাহিনী বিজয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু পরে তাদের মধ্যে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। এই সময়ে তিনি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে তীর ও তরবারি চালাতে শুরু করে দিলেন। এই সময় শত্রুপক্ষের নিক্ষিপ্ত তীর-বল্লমের আঘাতে তাঁহার দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। স্বয়ং নবী করীম (স) তাঁর এই বীরত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছেন। বলেছেনঃ আমি ডানে ও বামে তাকিয়ে দেখেছি উম্মে আম্মারা (রা) আমাকে রক্ষা করার জন্যে প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করছে। তাঁর পুত্রকে আহত করেছিল যে ব্যক্তি, তাকে সামনে পেয়ে তিনি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং ক্রমাগত তীর নিক্ষেপ করে করে তাকে হত্যা করে স্বীয় পুত্রের ওপর আক্রমণের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। একজন

অশ্বারোহী শত্রুসৈন্য তাঁর ওপর আক্রমণ চালালে তিনি ঢালের আড়ালে আত্মরক্ষা করেন এবং শত্রুসৈন্যটির ফিরে যাওয়ার সময় তার অশ্বের পা কেটে দিলেন। এই সময় তাঁর পুত্র মায়ের সাহায্যে এগিয়ে আসে এবং মা ও পুত্র মিলে শত্রুকে সম্পূর্ণ নিধন করেন। নবী করীম (স) নিজে এই দৃশ্য অবলোকন করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলেনঃ "আজ উম্মে আম্মারা তুলনাহীন সাহসিকতা ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছেন।"

ওহোদ ছাড়াও খায়বর, হুনাইন ও ইয়ামামা'র যুদ্ধেও তিনি যোগদান করেছিলেন। ইয়ামামা'র যুদ্ধে লড়াই করতে করতে তাঁর হাতখানাই শহীদ হয়ে যায়। এছাড়া তাঁর সর্বাঙ্গে বহুসংখ্যক ক্ষতও দেখা দিয়েছিল। ।–তাবাকাতে ইবনে সায়াদ

রোমানদের সাথে মুসলমানদের যে যুদ্ধ হয়, তাতে হযরত ইকরামা ইবনে আবু জেহেল-এর স্ত্রী হযরত উম্মে হুকাইম (রা)ও যোগ দিয়েছিলেন। আজনাদিন-এর যুদ্ধে হযরত ইকরামা শহীদ হয়েছিলেন। তার কিছুদিন পর হযরত খালিদ ইবনে সায়ীদের (রা) সাথে তাঁর পূনর্বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ফুলশয্যার রাত্রেই রোমানদের আক্রমণ শুরু হওয়ায় উম্মে হুকাইম (রা) প্রতিরক্ষা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং শত্রুপক্ষের সাতটি সৈন্যকে খতম করতে সক্ষম হন। –আল-ইস্তীয়াব

ইয়ারমূক যুদ্ধে হযরত আসমা বিনতে ইয়াজীদ নাম্নী মহিলা সাহাবীর হাতে নয়জন রোমান সৈন্য নিহত হয়। (আল-ইসাবা) হুনাইনের যুদ্ধে ইসলামী বাহিনী যখন যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করছিলেন, তখন উম্মে হারেস নাম্নী আনসার বংশের একজন মহিলা সাহাবী অত্যন্ত দৃঢ়তা সহকারে পর্বতের মত অবিচল থেকে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন।

হযরত আনাসের (রা)-এর জননী উম্মে সুলাইম ওহোদ ও হুনাইনের যুদ্ধে সশস্ত্র হয়ে যুদ্ধ করেন।

রোমানদের সাথে জিহাদে হাবীব ইবনে সালমা অদৃষ্টপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করেন। যুদ্ধ চলাকালে একদিন তাঁর স্ত্রী তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'আগামীকাল আপনি কোথায় থাকবেন'? তিনি বললেনঃ 'হয় শত্রুদের সাথে লড়াইয়ে ব্যস্ত, অথবা জান্নাতে-ইনশা 'আল্লাহ'। তাঁর স্ত্রী বললেনঃ 'আপনি যেখানেই থাকবেন, আমি আশা রাখি, আমিও আপনার সঙ্গে থাকব।'

এভাবে ইসলামের দুশমনদের ব্যর্থ করার ব্যাপারে মুসলিম নারী সমাজ সরাসরি ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামে বহুবার যোগদান করেছেন। বাতিল শক্তির বিনাশ

সাধনে তাঁরা পূর্ণ শক্তিতে এগিয়ে এসেছেন। যেখানে তাঁরা নিজেদের হাতে অস্ত্রধারণ করেন নি, সেখানে পুরুষদেরকে অস্ত্রধারণের জন্য সাহস ও হিম্মত যুগিয়েছেন। পাশাপাশি তাঁরা জিহাদে আহত লোকদের সেবা-শুশ্রূষা করেছেন। মুজাহিদরা যুদ্ধ করতে করতে পড়ে গেলে তাদের তুলে নেয়ার কাজ করেছেন; তাঁদের জন্যে খাবার তৈরী করে পৌঁছে দিতেন। তাঁরা ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়লে মহিলারা তাঁদের জন্যে বিশ্রামের ব্যবস্থা করতেন। পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লে মহিলারা তাঁদের পানি পান করাতেন। নবী করীম (স)-এর নেতৃত্বে ছয়টি যুদ্ধে যোগদানকারী একজন মহিলা সাহাবী বলেছেনঃ

كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى وَ نَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى. (بخاری، مسند احمد)

আমরা আহতদের জখমের ওপর ব্যাণ্ডেজ করতাম এবং রোগাক্রান্তদের চিকিৎসা বা সেবা-শুশ্রূষা করতাম।

উম্মে আতীয়া (রা) নাম্নী এক মহিলা সাহাবী রাসূলে করীম (স)-এর সাথে সাতটি যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। তিনি বলেছেনঃ 'আমি মুজাহিদদের জিনিস-পত্রের রক্ষণাবেক্ষণ করতাম। তাঁদের জন্যে খাবার তৈরী করতাম, আহতদের ও রোগাক্রান্তদের সেবাশুশ্রূষা করতাম।' –মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ

ওহোদের যুদ্ধে বহুসংখ্যক সাহাবী আহত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের খেদমত ও সেবা-শুশ্রূষার জন্যে মদীনা থেকে বহুসংখ্যক মহিলা সাহাবী ওহোদের যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেছিলেন। নবী দুহিতা হযরত ফাতিমা (রা)ও এ ব্যপারে কিছুমাত্র পশ্চাদপদ থাকেন নি। (ফতহুল বারী) হযরত আয়েশা ও উম্মে সুলাইম (রা)ও মুজাহিদদের খেদমতের কাজ করেছেন। তাঁরা এ কাজে এত তৎপরতা দেখিয়েছিলেন যে, তাঁদের দ্রুত চলাচলের ফলে তাঁদের দেহে পরিহিত অলঙ্কার পর্যন্ত দেখা যেত। তাঁরা পানির পাত্র পিঠের ওপর তুলে বহন করে আনতেন এবং মুজাহিদদের তা পান করাতেন। এ ধরনের কাজ তাঁরা বার বার করেছেন। হযরত উমর (রা) বলেছেনঃ উম্মে সুলাইম (মহিলা সাহাবী) ওহোদের দিন আমাদের জন্যে পাত্র ভরে ভরে পানি নিয়ে আসতেন। হুমনা বিনতে জাহাশ (রা)ও এ কাজ করেছেন সেদিন। তিনি তৃষ্ণার্তকে পানি পান করিয়েছেন এবং আহতদের চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষা করেছেন। এঁদের সঙ্গে শরীক ছিলেন উম্মে আয়মান নাম্নী অপর এক মহিলা সাহাবী। উম্মে আম্মারা নাম্নী মহিলা সাহাবী সকাল বেলাই আহতদের সেবা-শুশ্রূষা ও প্রাথমিক চিকিৎসার জন্যে জরুরী জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে ওহোদের যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক লিখেছেনঃ খায়বরের যুদ্ধে নবী করীম (স)-এর সঙ্গে বিপুল সংখ্যক

মহিলা সাহাবী যোগদান করেছিলেন। হাশর ইবনে জিয়াদের দাদী, আম্মা এবং আরও পাঁচজন মহিলাও এই যুদ্ধে যোগদান করেন। তাঁরা কি জন্যে এসেছেন জিজ্ঞেস করা হলে তাঁরা বললেনঃ

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ خَرَجْنَا نَغْزِلُ الشَّعْرَ وَ نُعِيْنُ بِهٖ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَعْنَا دَوَاءٌ لِلْجَرْحٰى وَ نُنَاوِلُ السِّهَامَ وَ نَسْقُ السَّوِيْقَ،(ابوداؤد)

হে রাসূল! আমরা এসেছি এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে, আমরা কবিতা পাঠ করব এবং এর সাহায্যে আমরা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের প্রেরণা যুগিয়ে সাহায্য করব। আমাদের সঙ্গে আহতদের চিকিৎসার ঔষধপত্র রয়েছে। তীর নিক্ষেপকারীদের হাতে আমরা তীর পরিবেশন করব এবং প্রয়োজন হলে ক্ষুধার্তদের ছাতু বানিয়ে খাওয়াব।

সবচেয়ে বড় কথা, এই মহিলারা কোন বাহ্যিক চাপে পড়ে যুদ্ধে যোগদান করেন নি এবং এসব ঝুঁকিপূর্ণ কাজ তাঁরা কোনরূপ বৈষয়িক প্রলোভনে পড়েও করেন নি। বরং তাঁরা দ্বীন-ইসলামের প্রতিরক্ষা এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সাহায্য, সহযোগিতা ও সাহচর্যকে নিজেদের জন্য বিশেষ সম্মানজনক ও পরকালে মহা কল্যাণ লাভের উপায় মনে করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই সব কাজে অংশগ্রহণ করতেন। তাই খায়বর যুদ্ধে যাত্রাকালে গিফার গোত্রের কয়েকজন মহিলা উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেনঃ

إِنَّا نُرِيْدُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَنْ نَخْرُجَ مَعَكَ إِلٰى وَجْهِكَ هٰذَا فَنُدَاوِي لْجَرْحٰى وَ نُعِيْنُ الْمُسْلِمِيْنَ بِمَا اسْتَطَعْنَا.

(طبقات ابن سعد ، ابن هشام)

হে রাসূল! আমরাও আপনার সঙ্গে যুদ্ধে গমন করার উদ্দেশ্যে হাজির হয়েছি। আমরা সেখানে আহতদের ঔষধপত্র দিয়ে সেবা-শুশ্রূষা করব এবং মুজাহিদদের যতটা সম্ভব সাহায্য করব।

দ্বীনের প্রতিরক্ষায় উৎসাহ দান

দ্বীন-ইসলামের প্রতিরক্ষা কাজে মুসলিম মহিলাগণ একদিকে যেমন তীর ও তরবারির সাহায্যে কাজ করেছেন, তেমনি এই উদ্দেশ্যে তাঁরা সাহিত্য ও বাকশক্তিরও পূর্ণ ব্যবহার করেছেন। এভাবে সত্য দ্বীনের ক্রমশঃ শক্তি বৃদ্ধিতে তাঁদের বস্তুগত শক্তি ও সাংস্কৃতিক শক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার সাধিত হয়েছে। এই

মহিলাদের উৎসাহব্যঞ্জক বক্তৃতা-ভাষণে বহুসংখ্যক লোক আল্লাহ্ তা'আলার দ্বীনের জন্যে তাঁরই পথে জান-মাল ও যথাসর্বস্ব লুটিয়ে দিতে উৎসাহিত হয়েছেন। ইবনে আবদুল বার নবী করীম (স)-এর ফুফু ও আবদুল মুত্তালিব দুহিতা আরওয়া সম্পর্কে লিখেছেনঃ

فَكَانَتْ بَعْدُ تَعْضُدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِسَانِهَا وَ تَحُضُّ ابْنَهَا عَلٰى نُصْرَتِهٖ وَ الْقِيَامِ بِاَمْرِهٖ، (الاستيعاب)

ঈমান গ্রহণের পর তিনি সর্বশক্তি দিয়ে নবী করীম (স)-এর সাহায্য-সহায়তা করতেন এবং তাঁর পুত্রকে নবী করীমে (স)-এর সাহায্যে ঝাঁপিয়ে পড়া ও তাঁর লক্ষ্যকে নিজের জীবন-লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়ার জন্যে বরাবর উৎসাহিত করছিলেন।

তাঁর পুত্র তুলাইব (রা) মক্কা শরীফের প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম কবুল করেছিলেন। রাসূলে করীম (স) একদিন গোপনে কয়েকজন সাহাবী সমভিব্যাহারে নামায পড়ছিলেন। কয়েকজন কাফির সরদার এই দৃশ্য দেখতে পেয়ে নামাযীদের অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে। সাহাবীগণ অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তাদের মুকাবিলা করেন। এই সময় হঠাৎ তারা তুলাইবকে ধরে বেঁধে ফেলে ও অমানুষিকভাবে মারধর করে। কিছুসংখ্যক কাফির তুলাইবের জননীকে এই সংবাদ দিয়ে বিদ্রূপ করে বলেঃ তুলাইব মুহাম্মাদের ধোঁকায় (?) পড়ে কি রকম মারধর খাচ্ছে, একবার দেখো গিয়ে। তুলাইবের জননী এই কথা শুনে বললেনঃ

خَيْرُ اَيَّامِهٖ طُلَيْبٍ يَوْمٌ يَذُبُّ عَنِ ابْنِ خَالِهٖ وَ قَدْ جَاءَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ تَعَالٰى (مستدرك حاكم)

তুলাইব যেদিন তার মামাতো ভাইর সমর্থনে দৃঢ়তার সাথে দাঁড়য়ে যাবে. সেই দিনটিই হবে তার সবচাইতে শুভ ও কল্যাণময় দিন। কেননা তার মামার এই ছেলেটি আল্লাহ্র নিকট থেকে প্রকৃত সত্য দ্বীন নিয়ে এসেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ (রা) ওহোদের যুদ্ধে আহত হলে তাঁর জননী তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করলেন এবং বললেনঃ

'হে পুত্র! ওঠো এবং তরবারি নিয়ে এই মুশরিক জাতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়

আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ্ বিনতে উত্বা ওহোদ যুদ্ধে মুসলিম শহীদদের বিরুদ্ধে কবিতা পাঠ করে কুৎসা রটাতে শুরু করলে হযরত আসমা (রা)-র কন্যা হিন্দ্ কবিতার ভাষায়ই তার কঠোর জবাব দেন। –ইবনে হিশাম

হযরত খানসা (রা) তাঁর চারটি সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে কাদেসিয়ার যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগের রাত্রে তিনি তাঁর পুত্র চতুষ্টয়কে একত্রিত করে যে নসীহত করেছিলেন, তা এক ঈমানদার ও মুজাহিদ জননীর মুজাহিদ সন্তানের জন্যে নসীহত হিসেবে ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। তিনি বলেছিলেনঃ

আমার প্রাণ-প্রিয় পুত্ররা! তোমরা নিজেদেরই আগ্রহ-উৎসাহে ঈমান গ্রহণ করেছ, কোন প্রকার চাপ প্রয়োগ ব্যতীতই তোমরা হিজরাত করে মদীনায় এসেছ। খোদার শপথ, তোমাদের মা এক, পিতাও তোমাদের এক। তোমাদের মা তোমাদের পিতার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেন নি। তোমাদের নানার বংশ-মর্যাদাকেও ক্ষুণ্ন বা কলঙ্কিত করেন নি একবিন্দু। তোমাদের বংশধারাকে কিছুমাত্র কালিমালিপ্ত করেননি। বস্তুতঃ তোমরা এক অত্যন্ত শরীফ ও পবিত্রা নারীর গর্ভজাত সন্তান। এই কারণে তোমাদের কাজকর্ম ও চরিত্র ভদ্রজনমণ্ডলীর মতই উত্তম ও উন্নতমানের হওয়া উচিত।

তোমরা জানো, কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করার বদলে আল্লাহ্ তা'আলা বিপুল ও বিরাট সওয়াব রেখেছেন। আল্লাহ্ যদি মঞ্জুর করেন এবং নিরাপদে সফল হয়, তাহলে সজাগ অন্তর্দৃষ্টি সহকারে খোদার সাহায্য চাওয়া ও পাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে শত্রুর মুকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়বে। যুদ্ধ ভয়াবহ হলে ও যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠলে তোমরা নির্ভীক চিত্তে ও অকুণ্ঠ মনে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কাফির শত্রুবাহিনী যখন প্রবল বিক্রমে ও অন্ধ আবেগে যুদ্ধে লিপ্ত হবে, তখন তাদের সেনাধ্যক্ষই হবে তোমাদের আক্রমণের লক্ষ্যবিন্দু। এইভাবে যুদ্ধ করে তোমরা ইহকালে বিজয় ও পরকালে জান্নাত লাভে ধন্য হওয়ার অধিকার নিয়ে ফিরে আসবে।

মহীয়সী জননীর নিকট থেকে সন্তানরা এইরূপ আবেগময়ী উপদেশ পেয়ে সকাল বেলাই তরবারি হাতে নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে চলে গেলেন। অতঃপর তাঁদের দেখা গিয়েছিল রক্ত-মাটি মিশ্রিত দেহাবয়ব সমন্বিত।' –আল-ইস্তীয়াব

সত্য প্রচার ও প্রয়োগ

স্বর্ণযুগে মুসলিম নারী সমাজ কেবল নিজেদের নিয়েই এবং দ্বীনের ওপর নিজেদের প্রতিষ্ঠিত রাখার কাজেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকতেন না এবং সেই

থাকাকেই তাঁরা নিজদের জন্যে যথেষ্টও মনে করতেন না। বরং সমাজ জীবনের যেখানে, যে দিকেই তাঁরা কোনরূপ বিপর্যয়, বিশৃঙ্খলা বা অসংলগ্নতা দেখতে পেতেন, তা দূর করে গোটা সমাজকে সুস্থ, সুশৃঙ্খল ও কল্যাণমুখী করে গড়ার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা শুরু করে দিতেন। ঐতিহাসিক ইবনে আবদুল বার লিখেছেনঃ

মহিলা সাহাবী সামুরা বিনতে নুহাইক (রা) হাটে-বাজারে ঘুরে-ফিরে ভাল ও কল্যাণময় কাজের আদেশ করতেন এবং খারাপ ও পাপ কাজ থেকে লোকদের বিরত রাখতে চেষ্টা করতেন। তাঁর হাতে একটা চাবুক থাকত। কাউকে কোন অন্যায় কাজে লিপ্ত দেখলেই তিনি তা দিয়ে তাকে প্রহার করতেন। —আল্-ইস্তীয়াব

এই ব্যাপারে মুসলিম মহিলাগণ না জনসাধারণকে কোন খাতির করেছেন, না শাসকশ্রেণীর লোকদের কোন পরোয়া করেছেন। তাঁদের ঈমানী আবেগ যেমন দ্বীনের প্রকাশ্য দুশমনদের প্রতিরোধ করেছে, তেমনি দ্বীনের নামধারী লোকদের চিন্তা-বিশ্বাস ও কাজকর্মের কোথাও একবিন্দু ব্যতিক্রম বা বিপর্যয় গোচরীভূত হলে তাও তারা বরদাশ্‌ত করতেন না। সত্য দ্বীনের কথা প্রকাশ ও প্রচার করার ব্যাপারে না বড় বড় শক্তিধরকে তাঁদের কাজের পথে প্রতিবন্ধক হতে দিয়েছেন, না প্রবল স্বৈরাচারী শাসকদের বাড়াবাড়িকে তাঁরা কিছুমাত্র মেনে নিতে প্রস্তুত হয়েছেন।

ইতিহাস প্রখ্যাত স্বৈরাচারী হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জুবাইর (রা)-কে শূলে চড়িয়ে শহীদ করে দেয়ার পর তাঁর জননী হযরত আসমা (রা)-এর নিকট গিয়ে বলে যে, আপনার পুত্র [হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জুবাইর (রা)] আল্লাহ্‌র ঘরে বে-দ্বীনী ও নাস্তিকতার প্রচার করছিলেন বলেই আল্লাহ্ তাঁকে কঠিন শাস্তি দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গেই হযরত আসমা (রা) তাকে ভর্ৎসনা করে বলে উঠলেনঃ

كَذِبْتَ كَانَ بِرًّا بِالْوَالِدَيْنِ صَوَّامًا قَوَّامًا لَقَدْ اَخْبَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهٗ سَيَخْرُجُ مِنْ ثَقِيْفٍ كَذَّابَانِ الْاٰخِرُ مِنْهُمَا شَرٌّ مِنَ الْاَوَّلِ وَ هُوَ مُبِيْرٌ ـ (مسند احمد)

তুমি মিথ্যা বলছো। আবদুল্লাহ আদৌ কোন বে-দ্বীন ছিলেন না। তিনি তো তাঁর পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার ও আচরণকারী ছিলেন, রোযাদার ও

তাহাজ্জুদ গুজারী ছিলেন। আসলে তুমিই তাঁর ওপর অমানুষিক জুলুম করেছ। রাসূলে করীম (স) আগেই আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, সকীফ গোত্রের দুজন মিথ্যাবাদী আত্মপ্রকাশ করবে। দ্বিতীয়জন প্রথমজনের তুলনায় অধিক নিকৃষ্ট হবে। কেননা, সে-ই অধিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করবে। (এই গোত্রের প্রথম মিথ্যাবাদী হল মুসাইলিমা আর দ্বিতীয়জন হলে তুমি।)

শাসক শ্রেণীর প্রতি উপদেশ-নসীহত

মুসলিম বিদূষী মহিলারা শাসক শ্রেণীর লোকদের প্রতি প্রয়োজনীয় উপদেশ-নসীহত করতেও কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করতেন না। উপদেশ-নসীহত হোক কিংবা সমালোচনা, দোষ-ত্রুটি ধরিয়ে দেয়া-তার মূলে নিঃস্বার্থপরতা ও আন্তরিকতা একান্তই অপরিহার্য। অন্যথায় তার কোন সুফল পাওয়ার আশা করা যায় না। উপরন্তু আন্তরিকতাহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত উপদেশ-নসীহত বা সমালোচনা প্রতিপক্ষের মনে বিদ্বেষের সৃষ্টি করে থাকে অনেক সময়। এই পর্যায়ে মুসলিম মহিলাদের উজ্জ্বল কীর্তি-কলাপের কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে।

তাঁদের সামনে যখনই দ্বীনের পক্ষে কল্যাণকর কোন কাজ করার বা কোন পদক্ষেপ গ্রহণের সুযোগ এসেছে, তখনই তাঁরা পূর্ণ আন্তরিকতা ও নিঃস্বার্থভাবে সে কাজ করেছেন। সাধারণ মুসলিম জনতা তো বটেই, রাষ্ট্রের প্রশাসকরাও তাঁদের সমালোচনাকে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে গ্রহণ করেছেন এবং সে উপদেশ-নসীহত শুনে তারা নিজেদের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে নিয়েছেন।

একবার হযরত মুয়াবিয়া (রা) হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট লিখে পাঠালেনঃ আমাকে এমন একটি সংক্ষিপ্ত উপদেশ দিন, যা আমি চিরদিন সামনে রেখে চলব। তখন হযরত আয়েশা (রা) তাঁকে নবী করীম (স)-এর একটি বাণী লিখে পাঠালেনঃ

مَنِ الْتَمَسَ رِضَى اللّٰهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللّٰهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللّٰهِ وَ كَلَهُ اللّٰهُ اِلَى النَّاسِ۔(ترمذی)

যে ব্যক্তি লোকজনকে অসন্তুষ্ট করে আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করতে চায়, লোকেরা তার কোন ক্ষতি করতে পারে না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে লোকদের অনিষ্টকারিতা থেকে রক্ষা করেন। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে অসন্তুষ্ট-ক্রুদ্ধ করে লোকদের সন্তুষ্ট করতে চায়, আল্লাহ্ সেই ব্যক্তিকে সেই

জনতার হাতে সঁপে দেন। (আর তারা যেমন-ইচ্ছা সেই ব্যক্তির ওপর নিজেদের আধিপত্য ও কর্তৃত্ব চালায়)।

খাওলা বিনতে সা'লাবা নাম্নী এক মহিলা সাহাবী আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ফারুক (রা)-কে পথিমধ্যে দাঁড়িয়ে নসীহত করতে লাগলেন। তিনি বললেনঃ

হে উমর! তোমাকে আমি উক্কাজের মেলায় দেখেছি, তুমি ডাণ্ডা দিয়ে ছোট বয়সের ছেলে-পেলেদের ভয় দেখিয়ে বেড়াতে। তখন তুমি ছোট ছিলে। সে সময় লোকেরা তোমাকে 'উমাইর' বলে ডাকত। পরে তুমি যখন যুবক হলে, তখন থেকেই লোকেরা তোমাকে উমর বলে ডাকতে শুরু করে। তারপর খুব বেশীদিন অতিবাহিত হতে না হতেই তুমি আমীরুল মু'মিনীন হয়ে গেলে। আল্লাহ্ তোমাকে কোথা থেকে কোন্ উচ্চতর মর্যাদায় পৌঁছে দিয়েছেন, তা তোমার ভেবে দেখা উচিত। জনগণের ওপর তোমার স্বভাব-সুলভ কঠোরতা কখনই প্রয়োগ করবে না, বরং তাদের ব্যাপারে তোমার উচিত খোদাকে ভয় করা। তোমার মনে রাখা উচিত, যে লোক খোদার আযাবকে ভয় করে, সে কিয়ামতকে কখনও বহু দূরবর্তী ব্যাপার মনে করতে পারে না আর যে লোক প্রতিমুহূর্ত মৃত্যু হতে পারে বলে বিশ্বাস করে, সে কখনও নিঃশঙ্ক, বেপরোয়া জীবন যাপন করতে পারে না। সে তো এমনভাবে সদাসতর্ক থাকবে, যেন নেক আমল ও জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পন্ন না করে কখনই থাকতে পারে না।

হযরত উমর ফারুক (রা)-এর সঙ্গী-সাথীরা বললেনঃ 'খাওলা! তুমি আমীরুল মু'মিনীনের প্রতি অকারণ উপদেশ দানে অনেক বাড়াবাড়ি করে ফেলেছ।' সঙ্গে সঙ্গে হযরত উমর (রা) তাদের থামিয়ে দিয়ে বললেনঃ 'তোমরা জান না, ইনি হচ্ছেন হযরত খাওলা বিনতে সা'লাবা (রা)।'

খলীফা উমর ফারুক (রা) একসময়ে মোহরানার পরিমাণ যথাসম্ভব কম করতে বললে সঙ্গে সঙ্গে একজন মহিলা তার প্রতিবাদ করে উঠলেন। বললেন, কুরআনে তো বলা হয়েছেঃ 'তোমরা যদি তোমাদের স্ত্রীদের একস্তূপ পরিমাণ সম্পদও দাও, তা হলেও তোমরা তার একবিন্দু ফিরিয়ে নিবে না। এর বিপরীত কথা বলার বা আইন জারি করার কোন অধিকারই আপনার নেই।'

খলীফা এ সমালোচনায় কিছুমাত্র অপমান বোধ করলেন না, মহিলাটিকেও কোন ধমক দিলেন না; বরং তিনি সহজভাবে নিজের ভুল স্বীকার করে বললেনঃ 'একজন স্ত্রীলোক উমরের সঙ্গে বিতর্ক করল এবং বিজয়ী হল'।

দায়িত্বশীল সরকারী কর্মচারীদের সামান্যতম জুলুমের বিরুদ্ধেও অভিযোগ করতে তেজস্বী মুসলিম মহিলারা কখনও সঙ্কোচ বা দ্বিধাবোধ করেন নি। এক মহিলা হযরত উমর ফারুক (রা)-এর নিকট এমনিই এক জুলুমের অভিযোগ করলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেই কর্মচারীকে বরখাস্ত করার ফরমান পাঠিয়ে দিলেন।

মুসলিম মহিলাদের এই বীরত্বপূর্ণ কাজ-কর্ম করার মূলে যে কারণ নিহিত রয়েছে, তা হলো, যে দ্বীন ও জীবন-ব্যবস্থার প্রতি তাঁদের অবিচল ঈমান ছিল, যে জীবন দর্শনকে তাঁরা একমাত্র সত্য জীবন দর্শন বলে বিশ্বাস করেছিলেন, যে নির্মল আলোর সাহায্যে সত্য-মিথ্যা ও ন্যায়-অন্যায়ের মাঝে তাঁরা পার্থক্য করতে সমর্থ হয়েছিলেন, সেই দ্বীন ও জীবন ব্যবস্থাই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব মানুষকে এই কাজ করার অধিকার দিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, এই কাজ করা যে অপরিহার্য কর্তব্য, অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে তার ঘোষণাও দিয়েছে।

মত প্রকাশ ও পরামর্শ দানের অধিকার

উপরোক্ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, ইসলামী সমাজের ভাল-মন্দ ও লাভ-ক্ষতির ব্যাপারে মুসলিম মহিলারা কখনও নিঃসম্পর্ক বা নীরব-নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে থাকতে পারে না। কেননা সমাজের ভাঙ্গা-গড়া, উন্নতি-অবনতি ও কল্যাণ-অকল্যাণের সাথে নারী-পুরুষ সকলেরই নিবিড় ও অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক বিদ্যমান। সমাজের কোন ক্ষতি সাধিত হলে তা থেকে নারীরা বেঁচে থাকতে পারে না। আবার সমাজের কল্যাণ সাধিত হলে তার সুফল নারী সমাজও সমানভাবে ভোগ করে। এমতাবস্থায় নারীরা সমাজের কল্যাণ সাধনের কাজ থেকে কিছুতেই দূরে সরে থাকতে পারে না। আর সে পর্যায়ে তাদের যদি কোন কাজ করতেই হয়, তাহলে সমাজকে অকল্যাণের দিকে নিয়ে যেতে ইচ্ছুক শক্তিগুলোর বিরুদ্ধতা ও শত্রুতারও সম্মুখীন হতে হবে তাদের। কল্যাণময় কাজের সমর্থন ও সহযোগিতা করতে এগিয়ে এলে সর্বপ্রকার অন্যায়, অসত্য ও অকল্যাণের প্রতিবাদ ও বিরুদ্ধতাও করতে হবে তাদের। এসব কাজে আত্মনিয়োগ করার তাদের স্বাভাবিক অধিকার রয়েছে। ইসলামী শরীয়ত তাদের এই অধিকার যেমন দিয়েছে, তেমনি এর দায়িত্বও তাদের ওপর অর্পণ করেছে। কাজেই সমাজ-সমষ্টিকেও তাদের এই অধিকার বাস্তবভাবে মেনে নিতে হবে। সমাজ জীবনের বিভিন্ন ব্যাপারে–তা ব্যক্তিগত হোক বা সামাজিক-সমষ্টিরই হোক–নিজেদের অভিমত ও হৃদয়াবেগ প্রকাশের অবাধ অধিকার সর্বতোভাবে স্বীকৃত। মৌখিকভাবে প্রকাশ, লেখনী চালানো ইত্যাকার যে কোন উপায়ে হোক, নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে এই মত প্রকাশের অধিকার তারা অনায়াসে ভোগ করতে পারবে। এই অধিকার থেকে কেউই তাদের বঞ্চিত রাখতে পারে না।

নারীদের একান্ত নিজস্ব ব্যাপারে-বিয়ে, খোলা তালাক গ্রহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে–ইসলামী শরীয়াত স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, অন্য কেউ নিজের সিদ্ধান্ত তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারে না। এ পর্যায়ে যা কিছু করা হবে, তা করতে হবে তাদের মতের ভিত্তিতে। রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেনঃ

لَا تُنْكَحُ الْاَيِّمُ حَتّٰى تُسْتَاْمَرَ وَ لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتّٰى تُسْتَاْذَنَ،(بخارى)

একবার বিবাহিতা নারীকে বৈধব্য বা তালাকপ্রাপ্তির পর পুনরায় বিয়ে দেয়া যাবে কেবলমাত্র তখন, যখন সে তা করার পরামর্শ দেবে। অনুরূপভাবে কুমারী মেয়েকে বিয়ে দেয়া যাবে শুধুমাত্র তার অনুমতি পাওয়ার পর।

ইয়াতীম মেয়েদের বিয়ে দেয়ার ব্যাপারেও সর্বপ্রথম তাদের সাথে পরামর্শ করতে হবে। কেননা তারা ইয়াতীম বলে বহু উদ্দেশ্যপরায়ণ স্বার্থপর ব্যক্তি তাদের ওপর নানাভাবে জুলুম-নির্যাতন চালাতে পারেঃ শরীয়াতের দেয়া অধিকার থেকেও তাদের বঞ্চিত করতে পারে; তাদের বিয়ে নিয়ে টালবাহানা করতে পারে। এই কারণে বিশেষভাবে তাদের মতামত নিয়েই তাদের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে, এর পূর্বে নয়। কেননা ইসলামী শরীয়াত যে তাদেরকে যাবতীয় ব্যাপারে দায়িত্বশীল বানিয়েছে, তা এভাবেই কার্যকর হতে পারে।

রাসূলে করীম (স) আরও বলেছেনঃ

اٰمِرُوا النِّسَاءَ فِىْ بَنَاتِهِنَّ،

স্ত্রীলোকদের সাথে তাদের কন্যাদের ব্যাপারে পরামর্শ কর।

বস্তুতঃ জীবনের যে সব ব্যাপারে স্ত্রীলোকেরা অন্যদের তুলনায় অধিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী, তুলনামূলকভাবে ভাল ও বেশী জানে, সেসব ব্যাপারে তাদের সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা গ্রহণ করে সমাজকে উপকৃত হতে হবে। নারী সমাজের সাথেও পরামর্শ করা এবং তাদের মতামত জানা ছিল রাসূলে করীম (স)-এর একটা স্থায়ী রীতি। হযরত হাসান বসরী বলেছেনঃ নবী করীম (স) প্রায়শঃই পরামর্শ করতেন, এমনকি স্ত্রীলোকদের সাথেও। তাদের পরামর্শও তিনি গ্রহণ করতেন। –উয়ূনুল আখবার

এই পরামর্শ গ্রহণের ব্যাপারে কোন বিষয় নির্দিষ্ট ছিল না। জীবনের যাবতীয় ব্যাপারেই তাদের সঙ্গে পরামর্শ করা হত। তাতে কোন একটা দিকও বাদ পড়ত না।

হুদাইবিয়ার সন্ধির একটি শর্ত ছিল, এই বছর মুসলমানরা উমরা না করেই ফিরে যাবে। তাই রাসূলে করীম (স) সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে হুদাইবিয়াতেই ইহ্‌রাম খুলে ফেলা ও সঙ্গে করে নিয়ে আসা পশুগুলো জবাই করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু সাহাবাগণ যেহেতু এই সন্ধি ও সন্ধির শর্তসমূহ দেখে বিশেষভাবে মর্মাহত হয়েছিলেন, সে কারণে তাঁরা কেউ রাসূলে করীম (স)-এর এই নির্দেশ পালনে কোন তৎপরতাই দেখালেন না। এইরূপ অবস্থা দেখে রাসূলে করীম (স) হযরত উম্মে সালমা (রা)-এর নিকট দুঃখ প্রকাশ করলেন। তিনি সাহাবাদের মনস্তত্ত্ব লক্ষ্য করে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা সহকারে পরামর্শ দিলেনঃ 'আপনি এরপর কাউকে আর কিছুই না বলে যা কিছু করার আপনি নিজেই অগ্রসর হয়ে করে ফেলুন। দেখবেন, সকলেই আপনার দেখাদেখি সব কাজই করবেন। তখন আর কেউ আপনার আদেশ পালনে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হবে না।' রাসূলে করীম (স) এই পরামর্শ সানন্দে গ্রহণ করলেন এবং যখনই তিনি করনীয় সব কাজ করলেন, সাহাবায়ে কিরাম (রা)ও তাঁর অনুসরণ শুরু করে দিলেন। এভাবে হযরত উম্মে সালমা (রা)-র যথার্থ ও সুচিন্তিত পরামর্শ উপস্থিত অচলাবস্থা দূর করতে সক্ষম হল এবং বাস্তবভাবে প্রমাণ করে দিল যে, মহিলাদেরও যথেষ্ট জ্ঞান-বুদ্ধি আছে এবং তাদের পরামর্শ জাতীয় জীবনের অনেক সমস্যারই সমাধান করতে সক্ষম। –বুখারী

রাসূলে করীম (স)-এর পর খুলাফায়ে রাশেদীনও তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে মহিলাদের দেয়া পরামর্শ গ্রহণ করতেন। একটি বর্ণনায় বলা হয়েছেঃ

اِنْ كَانَ عُمَرُ لَيَسْتَشِيْرُ فِى الْاَمْرِ حَتّٰى اِنْ كَانَ لَيَسْتَشِيْرُ الْمَرْءَةَ فَرُبَّمَا اَبْصَرَنِىْ قَوْلُهَا اَوِ الشَّىْءَ يَسْتَحْسِنُهُ فَيَاْخُذُبِهِ.

(السنن الكبرى بيهقى)

হযরত উমর (রা) অগ্রবর্তী সামষ্টিক বিষয়াদিতে মত দিতে সক্ষম লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। এমন কি এই ধরনের ব্যাপারে বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী কোন মহিলা হলেও তাঁর সাথে পরামর্শ করতেন। তাঁর দেয়া পরামর্শে কল্যাণের কোন দিক দেখতে পেলে কিংবা কোন ভাল পছন্দনীয় জিনিস পেলে তা তিনি নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতেন।

হযরত শিফা (রা) হিজরাতের পূর্বেই ঈমান এনেছিলেন। তিনি নবী করীম (স)-এর নিকট বায়'আতও গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বুদ্ধি-বিবেচনায় খুবই মর্যাদার অধিকারিণী ছিলেন। জীবনীকার ইবনে আবদুল বার লিখেছেনঃ

وَ كَانَ عُمَرُ يُقَدِّمُهَا فِى الرَّاْيِ وَ يُرْضِعُنَا وَ يُفَضِّلُهَا (الاستيعاب)

হযরত উমর (রা) পরামর্শদান ও মত প্রকাশে তাঁকে অগ্রবর্তী স্থান দিতেন। তিনি (কথাবার্তায়) তাঁকে সন্তুষ্ট রাখতেন এবং তাঁকে অন্যদের ওপর বিশেষ মর্যাদা দিতেন।

হযরত উসমান (রা) ও হযরত আলী (রা) সম্পর্কেও এই ধরনের নীতি অনুসরণ সংক্রান্ত বিবরণ গ্রন্থাবলীতে উদ্ধৃত হয়েছে। খলীফা নির্বাচনে পুরুষদের ন্যায় মহিলাদের মতামতও গ্রহণ করা হয়েছে।

বাস্তব কর্মে সহযোগিতা

মোটকথা, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক ব্যাপারে মহিলাদের বিবেক-বুদ্ধিপ্রসূত পরামর্শ গ্রহণ করে ইসলামী সমাজ বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছে। ইসলামী সমাজ গঠনেও তাঁদের যোগ্যতা-প্রতিভাকে বাস্তবভাবে কাজে লাগানো হয়েছে। নারীদের ওপর প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশগ্রহণের দায়িত্ব না থাকলেও তাঁরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে সব বিরাট বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, তা এই পর্যায়ে বিশেষভাবে স্মরণীয়। প্রয়োজনের সময় ইসলামী রাষ্ট্র-সরকারও তাঁদের থেকে এ ধরনের কাজ নেবার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতিহাসে তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) রাসূলে করীম (স)-এর মহিলা নীতির ব্যাখ্যা দান প্রসঙ্গে বলেছেনঃ

وَ قَدْ كَانَ يَغْزُوْبِهِنَّ فَيُدَاوِيْنَ الْجَرْحٰى. (مسلم، ترمذى)

রাসূলে করীম (স) মহিলাদের যুদ্ধ-জিহাদে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। তাঁরা সেখানে আহত ও রোগাক্রান্ত লোকদের চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষার কাজ আঞ্জাম দিতেন।

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেছেনঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُوْ بِاُمِّ سُلَيْمٍ وَ نِسْوَةٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَيُسْقِيْنَ الْمَاءَ وَ يُدَاوِيْنَ الْجَرْحٰى،(ابوداؤد ، مسلم)

রাসূলে করীম (স) উম্মে সুলাইম (রা) ও আনসার বংশের মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধে যেতেন। তাঁরা সেখানে পানি পান করাতেন ও আহত সৈনিকদের চিকিৎসা ইত্যাদি করতেন।

তাছাড়া অনেক সামাজিক ও ধর্মীয় কাজেও তাদের নিয়োগ করা হত। উম্মে অরাকা বিনতে আবদুল্লাহ (রা) বলেছেনঃ 'রাসূলে করীম (স) তাঁদের ঘরে যাতায়াত করতেন। তিনি তাঁদের জন্যে একজন মুয়াযযিনও নিযুক্ত করে দিয়েছিলেন; তিনি নামাযের আযান দিতেন এবং তাদের ইমামতিও করতেন।'

হযরত শিফা (রা) সম্পর্কে আল-ইস্তীয়াব গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ

رُبَّمَا وَ لَّا هَا (اى عمر) شَيْئًا مِنْ أُمُورِ السُّوقِ،

হযরত উমর (রা) অনেক সময় বাজারের কোন কোন দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত করতেন।

এ সব ঘটনা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, ইসলামী সমাজে মুসলিম মহিলাদের ওপর বহু প্রকারের রাজনৈতিক ও সামাজিক দায়-দায়িত্বও সঁপে দেয়া হত। আর এই মুসলিম মহিলাগণ নিজেদের পারিবারিক ও ঘর-গৃহস্থালীর দায়িত্ব পালন সহ এই সব সামাজিক কর্তব্যও পালন করতেন।

সামাজিক দায়িত্বপূর্ণ পদে নারী

ইসলামী সমাজে নারীর অবদান ও দায়িত্বপালন পর্যায়ে এ পর্যন্ত যা কিছু বলা হল, তার প্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠতে পারে, নারীদের কি কেবলমাত্র এ ধরনের কয়েকটি দায়িত্বেই নিয়োগ করা যেতে পারে কিংবা এ ছাড়া অন্যান্য সামাজিক-সামষ্টিক দায়িত্বও তাদের উপর অর্পণ করা সমীচীন বিবেচিত হতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে সর্বপ্রথম চিন্তাশক্তি ও বাস্তব কর্মের যোগ্যতা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিকোণ ও অভিমত জানতে হবে। জানতে হবে ইসলাম মহিলাদের উপর কতটা নির্ভর ও আস্থা স্থাপন করতে বলে বা তা করার অনুমতি দেয়। নারীরা প্রকৃতপক্ষে কোন্ ধরনের কাজের যোগ্যতার অধিকারী এবং ইসলামী সমাজে কি রকম দায়িত্বপূর্ণ কাজ তাঁদের উপর অর্পণ করা যায় আর কোন্ সব দায়িত্ব নয়, তা তারপরই জানা যাবে।

মানব সমাজের কাজ বহুমুখী, এর ধারা বহু রকমের আর প্রকৃতিও বিচিত্রগামী। এই কাজের সংখ্যা গুণে শেষ করা সম্ভব নয়। এ কাজ ছোট ছোট যেমন, তেমনি বড় বড়ও। সহজ সরল কাজও যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে অত্যন্ত জটিল ও বহু কষ্টসাধ্য কাজ। যদি কোন কাজের সুফল পেতে হয়, তাহলে সে কাজ সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করার মত যোগ্যতার অধিকারী লোকদেরই যে তাতে নিয়োগ করতে হবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আর কেবলমাত্র ইসলামী সমাজেই নয়, সাধারণভাবে ও নির্বিশেষে সব মানবীয় সমাজেরই এই নীতি। কাজেই এ কথাটি একান্তই শাশ্বত ও সাধারণ সত্য। সেই সঙ্গে এ কথাও সত্য যে, সব মানুষেরই সব রকম কাজ করার যোগ্যতা থাকে না, নেই-ও। কারও যদি এক ধরনের কাজের স্বাভাবিক যোগ্যতা থাকে, তবে সে যেমন অন্য বহু ধরনের কাজেরই যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত, তেমনি সমাজেরই অপর বহু লোক হয়ত সেই কাজেরই যোগ্যতা রাখে। কেউ এক কাজের উপযোগী, কেউ অপর কাজের যোগ্য। কেউ বৈজ্ঞানিক চিন্তা-গবেষণা শক্তির যোগ্যতা রাখে, কেউ রাখে সামরিক সংগঠন গড়ে তোলার যোগ্যতা। কেউ সঙ্গীত বা কবিতা লিখতে পারে আর কেউ উচ্চ মানের সাহিত্য রচনার যোগ্যতা রাখে। কেউ হস্তশিল্পে পারদর্শী আর কেউ খ্যাতিমান কণ্ঠশিল্পে। কেউ কেউ গণ-উদ্বোধক বক্তৃতা-ভাষণে পারঙ্গম হলেও গ্রন্থ রচনায় অক্ষম। আবার কেউ বড় বড় বই লিখতে সক্ষম হলেও বক্তৃতা দিয়ে পারে না জনগণকে উদ্বুদ্ধ

করতে। কেউ চিন্তাশক্তিতে গরীয়ান, কেউ দৈহিক শক্তিতে বলীয়ান। কেউ কেউ চিন্তা-গবেষণা দ্বারা যেমন মানব সমাজকে উপকৃত করতে পারে, তেমনি কেউ তার স্বাভাবিক সাহস-হিম্মতের সাহায্যে জাতির অনেক দুঃসাধ্য কাজ সামাধা করে জাতিকে পারে ধন্য করতে। শক্তি-ক্ষমতা ও যোগ্যতা-প্রতিভার এই সীমাহীন বৈচিত্রই মানব জাতির বৈশিষ্ট্য। এই বৈচিত্র্য মানব সমাজ ছাড়া সৃষ্টিলোকের অন্যত্র বিরল ও দুর্লভ। যোগ্যতা-প্রতিভার এই পার্থক্য প্রতি দু'জন লোকের মধ্যে-এমনকি একই পিতা-মাতার সন্তানদের মধ্যেও-সর্বত্র লক্ষ্যনীয়। অনুরূপভাবে এই পার্থক্য পুরুষ ও নারীর মধ্যেও অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীরভাবে বর্তমান। এই বৈচিত্র্য ও পার্থক্য অনিবার্য। কেননা মানব সমাজের সুষ্ঠুতা ও পূর্ণাঙ্গতা রক্ষার জন্য এই বৈচিত্র্য ও পার্থক্য অপরিহার্য। একই ধরনের যোগ্যতা-প্রতিভা সব মানুষের মধ্যে থাকলে সমাজের বহু জরুরী কাজই অসম্পন্ন হয়ে থাকত। অনেক প্রয়োজনই থাকত অসম্পূর্ণ হয়ে। তার ফলে মানুষের জীবনই অচল হয়ে যেত। অতএব এ কথা বলতেই হবে যে, এই বৈচিত্র্য ও পার্থক্য মহান সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি-কুশলতার অবিচ্ছিন্ন অংশ। স্বাভাবিক ও জন্মগতভাবেই এই বৈচিত্র্য ও পার্থক্যের সৃষ্টি। এই বৈচিত্র্যময় সৃষ্টিলোক যে যতটা প্রতিভা এবং যে কাজের যোগ্যতার অধিকারী, তা কেউ নিজে সৃষ্টি করে নি, কেউ নিজের জন্যে চেয়েও আনে নি।

নারীর স্বভাবগত দুর্বলতা

নারী ও পুরুষের মাঝে যে স্বভাবগত পার্থক্য ও ক্ষমতা-যোগ্যতার যে বৈচিত্র্যের কথা এইমাত্র বলা হল, ইসলামী শরীয়াত তাকে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে স্বীকৃতি দিয়েছে। বস্তুতঃ চিন্তাশক্তি ও কর্মশক্তি এই উভয় দিক দিয়েই এই পার্থক্য স্বীকৃত। নবী করীম (স) নারীদের বলেছেনঃ

نَاقِصَاتُ الْعَقْلِ وَ الدِّيْنِ، (بخاری)

বিচার বুদ্ধি ও দ্বীন-পালনের দায়িত্বের দিক দিয়ে অসম্পূর্ণ।

এর অর্থঃ নারীরা চিন্তা-শক্তি ও দৈহিক শক্তি—এই দু'দিক দিয়েই পুরুষদের তুলনায় কম যোগ্যতার অধিকারী। শারীরিক দিক দিয়েও নারীরা পুরুষদের তুলনায় দুর্বল। এই কারণে ইসলামী ফিকাহবিদগণ বলেছেনঃ

اَلرَّجُلُ خَيْرٌ مِّنَ الْمَرْأَةِ، (فتح القدير)

যোগ্যতা-ক্ষমতার দিক দিয়ে পুরুষ নারীদের তুলনায় অগ্রসর।

ইসলামী শরীয়াত নারীদের এই দুর্বলতার কথা স্বীকার করেই ক্ষান্ত হয় নি, জীবনের সকল ব্যাপারে তার প্রতি লক্ষ্য রেখেই দায়িত্ব বন্টনও করেছে। সে দুর্বলতাসমূহ সংক্ষেপে এইঃ

(১) নিয়মিত মাসিক ঋতুস্রাব নারী দেহের একটি বিশেষ সমস্যা। পুরুষেরা তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এই সময়ে নারীদের দৈহিক পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতাই শুধু বিলুপ্ত হয়ে যায় না, তাদের দেহ-মনেও দেখা দেয় এক ধরনের অসুস্থতা ও অক্ষমতা, যার দরুণ অধিক জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ করা এই সময় তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। এই কারণে এ সময়ে নামায পড়ার দায়িত্বও তাদের ওপর থেকে নেমে যায়। দ্বীনের দিক দিয়ে নারীদের যে অসম্পূর্ণতার কথা রাসূলে করীম (স) বলেছেন, এটা তার একটা প্রমাণ।

(২) স্বামী-স্ত্রীর যৌন সম্ভোগের ফল প্রায় দশ মাস দশ দিন ধরে কেবলমাত্র স্ত্রীকেই বহন করতে হয়- পুরুষদের বহন করতে হয় না। উপরন্তু সন্তান প্রসবকালীন প্রাণান্তকর যাতনা কেবল স্ত্রীকেই ভোগ করতে হয়, স্বামী (পুরুষ) এ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে। প্রসবকালীন এই কষ্টের দরুণই সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত নারীদের নামায পড়তে হয় না। এমন কি, এ সময়ের না পড়া নামায কাযাও করতে হয় না তাদের।

(৩) ঋতুস্রাব ও সন্তান প্রসবকালীন অশুচির সময় নারীকে ফরয রোযাও পালন করতে হয় না। পরে সে রোযা কাযা করার নিয়ম করা হয়েছে, যখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে। এমন কি সন্তানের স্তন্যপান কালে রোযার মাস এলে সে রোযা তখন পালন না করে পরে অন্য সময়ে পালন করতে পারে।

(৪) যুদ্ধ-জিহাদের কঠিন ও দুঃসহ দায়িত্ব পালন থেকেও নারী সমাজকে মুক্ত রাখা হয়েছে। বৃদ্ধ ও বালকদের মত তাদেরও নেই এ দায়িত্ব।

(৫) হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালনের ক্ষেত্রেও পুরুষদের থেকে নারী হজ্জযাত্রীকে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

নারীদের শারীরিক দুর্বলতার কারণেই শরীয়াতের এই বিশেষ ব্যবস্থা।

নারীদের মানসিক যোগ্যতা

নারীদের মানসিক দুর্বলতা সম্পর্কে নবী করীম (স)-এর কথা উপরে উদ্ধৃত হয়েছে। এই মন্তব্যের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়ঃ

মানুষের মানসিক শক্তিকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম হল শুধু বুদ্ধি-বিবেচনার যোগ্যতা। তা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই বর্তমান। দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে, খুঁটিনাটি ব্যাপারে ইন্দ্রিয় শক্তি প্রয়োগলব্ধ জ্ঞান। যেমন চোখে দেখে বর্ণ ও আস্বাদন করে স্বাদ নির্ধারণ। অতঃপর সে সম্পর্কে বিবেক-বুদ্ধির প্রয়োগ চিন্তা-গবেষণার সাহায্যে নির্ভেজাল চিন্তাগত তত্ত্ব ও তথ্য অর্জন। এই যোগ্যতাটুকু থাকলেই শরীয়াতের বিধান পালনের দায়িত্ব অর্পিত হয়। তৃতীয় পর্যায়ে প্রাথমিক ও বাহ্যিক সত্যগুলো থেকে কোনরূপ শ্রম ও সময় ক্ষেপন ব্যতীতই মতাদর্শ আয়ত্ত করা আর চতুর্থ পর্যায়ে রয়েছে, এসব মতাদর্শ মনের পর্দায় সর্বক্ষণ এমনভাবে জাগ্রত ও ভাস্বর রাখা, যেন তা চোখের সম্মুখে উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান।

শরীয়াতের সাধারণ প্রয়োগ নির্ভর করে দ্বিতীয় পর্যায়ের ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান তথা বিচার উপস্থিতির উপর। নারীদের মধ্যেও এ পর্যায়ের জ্ঞান-বুদ্ধি রয়েছে। কেননা তারাও খুঁটিনাটি ব্যাপারে ইন্দ্রিয় শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সুস্পষ্ট জ্ঞানসমূহ লাভ করতে সক্ষম। তারা কোন ভুলে যাওয়া কথা স্মরণ করিয়ে দিলে পুনরায় তা স্মৃতিপটে জাগরুক করতে পারে। এরূপ ক্ষমতাও যদি নারীদের না থাকত, তাহলে শরীয়াতের হুকুম-আহকাম পুরুষ থেকে নারীদের জন্য ভিন্ন রকমের হত। অথচ তা করা হয়নি; বরং উভয়ের ওপর সমান দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, নবী করীম (স) নারীদের যে বিচার-বুদ্ধির ন্যূনতার কথা বলেছেন, তা তৃতীয় পর্যায়ের জ্ঞানের যোগ্যতা। নারীরা সাধারণত এ থেকে বঞ্চিত। -আল-ইনায়া

মোটকথা, শরীয়াতের দৃষ্টিতে নারীর তুলনায় পুরুষদের বিচার-বুদ্ধি অধিক নির্ভরযোগ্য। নারীদের সাক্ষ্যদানের ব্যাপারটি এ পর্যায়ে দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ্য। নবী করীম (স) বলেছেনঃ

• شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ شَهَادَةِ الرَّجُلِ، (بخارى)

নারীদের সাক্ষ্য পুরুষদের সাক্ষ্যের অর্ধেক।

কুরআন মজীদে লেন-দেনের ব্যাপারে দুজন পুরুষ সাক্ষীর কথা বলা হয়েছে প্রথমে। পরে বলা হয়েছে, দুজন পুরুষ এক সঙ্গে পাওয়া না গেলে একজন পুরুষ ও দুজন মহিলাকে সাক্ষী মানা যাবে। এই দুজন মহিলা একজন পুরুষের বিকল্প। –সূরা আল-বাকারা

তবে বিশেষভাবে নারী সংক্রান্ত বিষয়াদিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে শুধুমাত্র নারীদের সাক্ষ্যই যথেষ্ট। কেননা পুরুষরা এ সব বিষয়ে কিছুই জানে না বললেই

চলে। যেমন সন্তান প্রসব ও নারী-দেহের গোপন অঙ্গের ত্রুটির ব্যাপারে কেবল নারীরাই সাক্ষ্য দিতে পারে। তাই ইমাম জুহ্‌রী লিখেছেনঃ

مَضَتِ السُّنَّةُ اَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ

যে সব বিষয়ে নারী ছাড়া অন্যদের জানার সুযোগ নেই, সে সব বিষয়ে কেবলমাত্র নারীদের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করা জায়েয়-পূর্ব থেকেই এ রীতি চলে এসেছে।

যে সব ব্যাপারে নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য এবং শেষ পর্যন্ত নারীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা চলে-সেই সব ব্যাপার পর্যন্ত নারীদের মানসিক যোগ্যতাও স্বীকৃত। কেননা নিছক সাদামাটা সংবাদ দেয়াকেই সাক্ষ্যদান বলা যায় না। ঘটনাকে তার আসল রূপে অধ্যয়ন করা ও তার যথার্থ ব্যাখ্যা দানকে বলা হয় সাক্ষ্য। এটা সহজ ব্যাপার নয়। এর জন্যে প্রয়োজন বাইরের জীবন সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। এইরূপ সাক্ষ্য দেয়ার অর্থই হল নিজের কাঁধে এক বিরাট গুরুদায়িত্ব চাপিয়ে নেয়া। সাক্ষী এ দায়িত্ব বহন করলেই বিচারক তার ভিত্তিতে মূল্যবান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হন। এইরূপ সাক্ষ্য পাওয়ার পরও বিচারক যদি তদনুরূপ রায় না দেন, তাহলে তিনি অতিবড় গুনাহ্‌র অপরাধে অপরাধী হবেন। এরূপ অবস্থায় বিচারক পদচ্যুতও হয়ে যেতে পারেন। এই মতের ভিত্তিতে ইসলামী আইনবিদরা সিদ্ধান্ত দিয়েছেনঃ

اَهْلِيَةُ الْقَضَاءِ تَدُورُ مَعَ اَهْلِيَةِ الشَّهَادَةِ.(بدائع الصنائع)

সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা থাকলে বিচারক হওয়ার যোগ্যতাও আছে বলে মনে করতে হবে।

এর অর্থ হচ্ছে, যদি কেউ কোন বিষয়ে সাক্ষ্যদানের যোগ্যতার অধিকারী হয়ে থাকে, তাহলে সে বিষয়ে বিচার করার যোগ্যতারও সে অধিকারী, একথা মানতে হবে।

এই দৃষ্টিতে মর্যাদায় সমান না হলেও জীবনের সর্ব ব্যাপারেই নারীর সাক্ষ্য গ্রহণীয় বলে ফিকাহ্‌বিদগণ মত দিয়েছেন। আর কোন কোন ক্ষেত্রে কেবল মাত্র নারীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বিরোধীয় ব্যাপারসমূহে রায় দান করতেও কোন আপত্তি নেই।

এই কারণে জীবনের সর্ব বিষয়ে নারী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহের ওপর পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপনে কারুর মনে এক বিন্দু সন্দেহের উদ্রেক হয় নি। নারী ও পুরুষের বর্ণিত হাদীসের মধ্যে শুধু যে কোনরূপ পার্থক্য করা হয়নি তা-ই নয়,

বরং উভয় ধরনের হাদীসকেই সমান মর্যাদা ও গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা হয়েছে। এই পর্যায়ের বড় দৃষ্টান্ত হিসেবে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা)-এর ভগিনী ফারীয়া (রা)-এর স্বামীর কয়েকটি উট পালিয়ে যায়। উটের মালিক উটগুলোর খোঁজে বের হয়ে যান এবং সেগুলো পেয়েও যান। কিন্তু সহসা উটগুলো ক্ষেপে গিয়ে তাঁর ওপর আক্রমণ চালায়। ফলে তিনি নিহত হন। ফারীয়া (রা) রাসূলে করীম (স)-এর নিকট এই ঘটনা বিবৃত করেন। বলেনঃ আমার স্বামীর মৃত্যু সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু তিনি আমার জীবিকা নির্বাহের জন্যে কিছুই রেখে যান নি। এমন কি, তাঁর সন্তানদের নিয়ে বসবাস করার জন্যে একটুখানি জায়গাও রেখে যান নি। এই কারণে আমি আমার ভাইদের সাথে বসবাস করতে চাই। এ বিষয়ে আপনার নির্দেশ কি? জবাবে নবী করীম (স) বললেনঃ 'ঠিক যে বাড়িতে থাকা অবস্থায় তুমি তোমার স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ পেয়েছ, সেই ঘরে থেকেই তোমাকে ইদ্দাত পালন করতে হবে'। উত্তরকালে হযরত উসমান (রা)ও অনুরূপ পরিস্থিতিতে ঠিক একইরূপ নির্দেশই দিয়েছিলেন। ফলে ফারীয়া নাম্নী একজন মাত্র মহিলার একটি বর্ণনা আইনের ভিত্তি হওয়ার মর্যাদা পেল। এমন বহু হাদীসই মুসলমান সমাজে প্রচলিত রয়েছে, যার বর্ণনাসূত্রে পর পর চার জন মহিলা রয়েছেন। -মুসলিম, কিতাবুল ফিতান। বড় বড় মুহাদ্দিসগণ তাঁদের বর্ণিত এ সব হাদীস নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু জীবনের প্রতিটি বিভাগে মহিলাদের বর্ণিত হাদীস গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে মহিলাদের সাক্ষ্যকে পুরুষদের সমান মর্যাদা দেয়া হয়নি শুধু মনস্তাত্ত্বিক কারণে। সাধারণতঃ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সাহাবী বা তাবেয়ী মহিলাগণ যতটা দায়িত্ব-সচেতন থাকেন, নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে তাদের থেকে ততটা সতর্কতার আশা করা যায় না। সাক্ষ্যদান ও হাদীস বর্ণনা গ্রহণের ব্যাপারে এ কারণেই পার্থক্য করা হয়েছে।

নারীদের কর্মক্ষমতা

এ পর্যন্তকার আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, শরীয়াতের দৃষ্টিতে জীবনের সমস্যাবলী দুই ধরনের। এমন অনেক ব্যাপারই রয়েছে, যাতে নারীদের বিচার-বুদ্ধি ও বিবেচনা-শক্তির ওপর পুরাপুরি নির্ভর করা চলে। পক্ষান্তরে অনেক ব্যাপার এমনও আছে, যাতে নারীদের বিবেচনা-শক্তি বা স্মরণ-শক্তি ভুল করে বসতে পারে, তার আশঙ্কা পূর্ণ মাত্রায় রয়েছে। বাস্তব কর্মক্ষেত্রেও শরীয়াত এই নীতিই গ্রহণ করেছে। শরীয়াত এক দিকে নেতৃত্বের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন থেকে নারীদের অব্যাহতি দিয়েছে। কেননা প্রকৃতপক্ষে সমাজ

সমষ্টির নেতৃত্বের জন্যে যে বিশেষ গুণাবলী ও যোগ্যতা-কর্মক্ষমতা একান্তই অপরিহার্য, তা নারীদের মধ্যে অনুপস্থিত। অপর দিকে রাসূলে করীম (স) বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেনঃ

وَ الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَ هِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ،

(بخاری)

নারী তার স্বামীর ঘরের লোকদের ও তার সন্তানদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল এবং তাদের সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সে তাদের প্রতি কর্তব্য কতটা পালন করেছে, তাদের অধিকার কতটা আদায় করেছে, সে বিষয়ে তাকে জবাবদিহি করতে হবে।

কিন্তু নারীকে শুধু ঘরের আভ্যন্তরীণ বিষয়াদির জন্যে দায়িত্বশীল বানানো হল কেন? হাফেয ইবনুল হাজার এ পর্যায়ে লিখেছেনঃ

إِنَّمَا قُيِّدَ بِالْبَيْتِ لِأَنَّهَا لَا تَصِلُ إِلَى مَا سِوَاهُ غَالِبًا إِلَّا بِإِذْنٍ خَاصٍّ،

(فتح الباری)

কেবলমাত্র ঘরের ভেতরে নারীদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। কেননা ঘরের অভ্যন্তর ছাড়া অন্য কোন স্থানে তাদের নির্বাধে পৌঁছা সম্ভব নয়। তবে বিশেষ অনুমতি বা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কোন সুযোগ লাভ করলে সে কথা স্বতন্ত্র।

অর্থাৎ মেয়েদের আসল স্থান ও অবস্থান-কেন্দ্র তাদের ঘর। ঘরের সমস্যাবলী নিয়েই তাদের দিন-রাত ব্যস্ত থাকতে হয়। এ কারণে ঘরের বাইরে কোন কিছুর জন্যে তাদের দায়িত্বশীল বানানোর কোন প্রশ্নই ওঠে না এবং তা নিতান্তই তাৎপর্যহীন।

এক্ষণে দেখতে হবে, ঘরের মধ্যেই স্ত্রীলোকদের সংরক্ষণ, পরিচালন ও দায়িত্ব পালনের প্রকৃত তাৎপর্য কি?

এর তাৎপর্য এই যে, ঘরের আভ্যন্তরীণ যাবতীয় বিষয়ের ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব নারীর। ঘরের লোকেরা তার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনাধীন। তাদের সকলের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ করা তারই কর্তব্য। শরীয়াতের বিধান অনুযায়ী তাদের নিত্য-নৈমিত্তিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত করা, ঘরের পরিবেশ শরীয়াতের আলোকে গড়ে তোলা এবং ঘরোয়া অনুষ্ঠানাদি

শরীয়াত মুতাবিক পালন করা তারই দায়িত্ব ও কর্তব্য। তদ্রূপ অন্যায় আচার-আচরণ ও অনুষ্ঠানাদি থেকে তাদের বিরত রাখা, ভাল-মন্দ ও লাভ-লোকসান সম্পর্কে তাদের অবহিত করা-ঠিক যেমন রাখাল তার পরিচালিত প্রাণীগুলোর দেখা-শুনা ও রক্ষণা-বেক্ষণ করে–নারীর একান্ত কর্তব্য। এখানেই নারীর দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। স্বামী ঘরের খরচাদি চালাবার ও পারিবারিক কাজকর্ম আঞ্জাম দেয়ার জন্যে যে অর্থ-সম্পদ তার হাতে তুলে দেয়, তার যথাযথ ব্যয়-ব্যবহার করাও তারই কর্তব্য। কারণ সে-ই তার সংরক্ষক ও আমানতদার। তাই সদাচারী স্ত্রীর গুণ বর্ণনা পর্যায়ে রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেনঃ

وَ اِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِىْ نَفْسِهَا وَمَالِهٖ (ابن ماجة)

স্বামী যদি স্ত্রীর নিকট থেকে বাইরে বা দূরে চলে যায়, তাহলে সে-ই নিজের পবিত্রতা এবং তার (স্বামীর) ধন-মালের ব্যাপারে কল্যাণকামী হবে।

ঘরের আভ্যন্তরীণ দায়িত্ব-কর্তব্যও স্ত্রীরই অধিকারে সঁপে দেয়া হয়েছে। রাসূলে করীম (স) হযরত ফাতিমা (রা) ও হযরত আলী (রা)-র মধ্যে পারিবারিক ও গার্হস্থ্য কাজ-কর্মকে স্পষ্টতঃ ভাগ করে দিয়েছিলেন। হযরত ফাতিমা (রা)-কে দায়িত্বশীল বানিয়েছিলেন ঘরের আভ্যন্তরীণ যাবতীয় কাজ-কর্মের এবং হযরত আলী (রা)-র উপর অর্পিত ছিল বাইরের সব কাজের দায়িত্ব। –যা'দুল-মায়াদ

ইসলামে স্ত্রীকে ঘরের আভ্যন্তরীণ বিষয়াদির দায়িত্ব ও কর্তব্য দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। এই দায়িত্ব ও কর্তব্য নিজের বিবেক-বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা অনুযায়ী সুষ্ঠু রূপে সম্পন্ন করার জন্যে যে স্বাধীনতা অপরিহার্য, ইসলাম তাও তাকে দিয়েছে পুরাপুরিভাবে। এমন কি, ঘরের কাজকর্ম সম্পাদন, বিশেষভাবে সন্তান লালন-পালন পর্যায়ের প্রয়োজন পূরণের জন্যে স্বামীর অজ্ঞাতসারেই যদি তার ধন-সম্পদ ব্যয় করতে হয়, তবু তা করার অধিকার স্ত্রীর রয়েছে। একটা বিশেষ সীমা পর্যন্ত স্বামীর ধন-সম্পদ থেকে দান-খয়রাত করারও অধিকার রয়েছে স্ত্রীর।

–বুখারী

বস্তুতঃ পারিবারিক জীবনে নারীর যোগ্যতা, বিচক্ষণতা ও কর্মক্ষমতার ওপর ইসলাম বিরাট আস্থা ও নির্ভরতা পোষণ করে। তার বড় প্রমাণ এই যে, সন্তানরা পূর্ণ-বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত তাদের লালন-পালন ও রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব পালনে ইসলাম পুরুষদের তুলনায় স্ত্রীলোকদেরকেই অধিক উপযুক্ত বলে মনে করেছে। বিবাহ বিচ্ছেদের পর সন্তানদের লালন-পালনের অধিকার নিয়ে পিতা-মাতার মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হলে পিতার পরিবর্তে মায়ের ওপরই এই দায়িত্ব ন্যস্ত করা

হয়েছে খোদ রাসূলে করীম (স)-এর বিচারে। ইতিহাসে বা হাদীসে এ ধরনের অনেক ঘটনারই উল্লেখ রয়েছে। তার কারণ স্বরূপ ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেনঃ

لِاَنَّهُنَّ اَشْفَقُ وَ اَرْفَقُ وَ اَهْدٰى اِلٰى تَرْبِيَةِ الصِّغَارِ،

সন্তান পালনের সর্বাধিক অধিকার স্ত্রীদের। কেননা তারা পুরুষদের তুলনায় অধিক দয়ার্দ্র-হৃদয়, কোমলমতি ও অনুগ্রহশীল হয়ে থাকে। ছোট ছোট শিশুদের লালন-পালন ও প্রশিক্ষণের যোগ্যতা ও উদ্যম-প্রেরণা তাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই বেশী।

মহিলাদের স্বতন্ত্র সংগঠন

শিশু-সন্তানের লালন-পালনের ব্যাপারে নারীদের যোগ্যতা যখন পুরুষের তুলনায় বেশী এবং এ কারণে পুরুষদের ওপর তাদের অগ্রাধিকারও দেয়া হয়েছে, তখন সমাজের যে-সব ক্ষেত্রে তাদের সেবামূলক কর্মক্ষমতা অধিক অবদান রাখতে সক্ষম এবং যে-সব ক্ষেত্রে এই নারীসুলভ সেবা-শুশ্রূষামূলক কার্যাবলী অপরিহার্য বিবেচিত হবে, সেই সব ক্ষেত্রে তাদেরকেই অগ্রসর করা হবে, এ-ই তো স্বাভাবিক। এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, এই উদ্দেশ্যে তাদের ব্যক্তিগত চেষ্টা-সাধনার সঙ্গে সঙ্গে সামষ্টিক চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালানোর অনুমতি তাদের জন্যে থাকতে হবে। ইসলামী শরীয়াত এ ব্যাপারে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে না। এই কারণে নবী করীম (স) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে মহিলাদের কোন স্বতন্ত্র সংগঠন ছিল কিনা, এ প্রশ্ন নিতান্তই অবান্তর। কেননা সমাজিক সংগঠন-সংস্থা গড়বার কারণ থাকলেই তা গড়ে ওঠে। সেকালে এ ধরনের কোন কারণ হয়ত দেখা দেয় নি বলেই তা হয়নি। শুধু নারীদের সংগঠনই নয়, একালের মত কোন প্রকার সামাজিক সংগঠন-সংস্থা তখন আদৌ ছিল কিনা, তাও অনুসন্ধান সাপেক্ষ। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা অনস্বীকার্য, বিভিন্ন দ্বীনী ও সামাজিক প্রয়োজনে স্ত্রীলোকেরা সমবেত হয়েছেন। অনেক সময় তাঁরা মিলিত হয়ে বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা-বিবেচনা করেছেন এবং নিজেদের ধ্যান-ধারণা ও বাস্তব সমস্যাগুলো রাসূলে করীম (স)-এর সমীপে পেশ করেছেন। তিনিও সেসব বিষয়ের সমাধান তাদের বলে দিয়েছেন। এইসব ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে যে, বহু সংখ্যক মহিলা একত্রিত হয়ে সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে রাসূলে করীম (স)-এর সমীপে উপস্থিত হলেও তাঁরা সকলেই এক সঙ্গে কথা বলেন নি; নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে নেত্রীপদে বাছাই করে তার মাধ্যমেই কথা বলেছেন। সেই মহিলা নেত্রী যা কিছু বলেছেন, তাতে তিনি নিশ্চয়ই সকলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, যেমন বর্তমানের কোন সংগঠন-সংস্থার নেতা সাধারণত করে থাকেন। এক

বারের ঘটনায় হযরত জায়েদ (রা)-এর কন্যা হযরত আসমা (রা) নেত্রী হিসেবে রাসূলে করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেনঃ

إِنِّيْ رَسُوْلُ مَنْ وَرَائِيْ مِنْ جَمَاعَةِ النِّسَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ كُلُّهُنَّ يَقُلْنَ بِقَوْلِيْ وَعَلٰى مِثْلِ رَأْيِ، (الاستيعاب)

আমার পশ্চাতে মুসলিম মহিলাদের যে দল রয়েছে, আমি তাদেরই প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত হয়েছি, তাঁদের সকলেই আমার কথা বলেছেন এবং আমি যে মত পোষণ করি, তাঁরাও সেই মতই পোষণ করছেন।

দ্বীন-ইসলামের নীতি ও আদর্শের দৃষ্টিতে বিবেচনা করা হলে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে যে, মহিলাদের স্বতন্ত্র সংগঠন-সংস্থা গড়ে তোলা কিছুমাত্র অন্যায় নয়। নারীরা পুরুষের থেকে আলাদাভাবে জামা'আতের সাথে নামায পড়তে পারে। উম্মে আরাক্বা নাম্নী মহিলা সাহাবীকে নবী করীম (স) নিজেই নির্দেশ দিয়েছিলেন ঘরের লোকদের নিয়ে একত্রে নামায পড়তে ও তাতে ইমামতি করতে। নবী করীম (স)-এর পরে মহিলা সাহাবীগণ এই রীতিকে চালু রেখেছিলেন। তাঁরা ফরয ও নফল সর্বপ্রকার নামাযই জামা'আতের সাথে পড়েছেন এবং তাতে তাঁরাই ইমামতি করেছেন। রীতা হানফীয়া নাম্নী তাবেয়ী মহিলা বর্ণনা করেছেনঃ

اَمَّتْنَا عَائِشَةُ فَقَامَتْ بَيْنَهُنَّ فِى الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ

হযরত আয়েশা (রা) আমাদের মহিলাদের ইমামতি করেছিলেন ফরয নামাযে। অবশ্য তিনি মহিলাদের মধ্যেই দাঁড়িয়েছিলেন। (পুরুষের ন্যায় কাতারের সম্মুখে দাঁড়ান নি।)

তাইমা বিন্‌তে সালমা বলেছেনঃ হযরত আয়শা (রা) মাগরিবের ফরয নামাযের ইমামতি করেছেন। তিনি মহিলাদের সঙ্গে কাতারে দাঁড়িয়েছেন এবং উচ্চৈস্বরে কেরাআত পাঠ করেছেন। –আল-মুহাল্লা, ইবনে হাজম

'মুস্তাদরাকে–হাকেম' হাদীস গ্রন্থে বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছেঃ

اِنَّهَا كَانَتْ تُؤَذِّنُ وَ تُقِيْمُ وَ تَؤُمُّ النِّسَاءَ وَتَقُوْمُ وَسْطَهُنَّ

হযরত আয়েশা (রা) নামাযের আযান দিতেন, ইকামত বলতেন, মহিলাদের ইমামতি করতেন এবং তিনি তাদের মাঝখানে দাঁড়াতেন।

বস্তুতঃ মেয়েদের আলাদা জামা'আতে নামায পড়া ও তাতে একজন মহিলার ইমামতি করা সম্পূর্ণ জায়েয। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) এই মত প্রকাশ করেছেন।

জামা'আতের সাথে নামায মুসলিম উম্মতের সংগঠন-সংস্থার একটা ক্ষুদ্র নমুনা। এই কারণে নামাযের ইমামতিকে 'ক্ষুদ্র পরিসর নেতৃত্ব' বলা হয়। এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, মহিলাদের ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত ও শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ক সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে তাদের নিজস্ব সংগঠন গড়ে তোলা শুধু যে জায়েয তাই নয়, একান্ত জরুরীও। এইসব সংগঠন-সংস্থাকে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক-সামষ্টিক পর্যায়ের কার্যাবলী সমাধা করার পূর্ণ স্বাধীনতা ও সুযোগ-সুবিধা দেয়া যেতে পারে। এসব সংগঠন-সংস্থা মেয়েদের শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কল্যাণমূলক কাজ সুসম্পন্ন করবে। মহিলাদের নিজেদের মামলা-মুকদ্দমার মীমাংসা করার উদ্দেশ্যে নিজস্ব আদালত গঠন করা এবং বিচার ও আইন-প্রয়োগ পর্যায়ের অধিকারও তারা ভোগ করতে পারেন কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা ব্যতীতই।

নারী ও নেত্রীপদ

এই পর্যায়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, ইসলাম নারীকে জাতীয় নেতৃত্ব ও পথ-প্রদর্শক হওয়ার মত কোন পদের দায়িত্ব অর্পণ করে না। এটা এজন্যে নয় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে নারী পুরুষের তুলনায় হীন বা দীন। এর প্রকৃত কারণ হল, জাতীয় নেতৃত্ব দানের জন্যে যেসব যোগ্যতা একান্তই জরুরী, তা নারীদের মধ্যে স্বভাবতঃই নেই। আর ইসলাম যেহেতু যার মধ্যে যে কাজের যোগ্যতা নেই, তাকে সেই কাজের দায়িত্ব দেয় না। এ কারণেই জাতীয় নেত্রী পদের দায়িত্ব কেবলমাত্র পুরুষদের উপরই ন্যস্ত করতে ইচ্ছুক, নারীদের উপর নয়। যেসব ক্ষেত্রে কাজ করার যোগ্যতা নারীদের দেয়া হয়নি, সেইসব ক্ষেত্রে তাদের ওপর দায়িত্ব অর্পণ নিতান্তই অযৌক্তিক কাজ হবে। আর এই অযৌক্তিক কাজ করা হলে জাতীয় জীবনে বিপর্যয়, অচলাবস্থা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়া ছাড়া তার আর কোন পরিণতি হতে পারে না। এ কারণেই নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেনঃ

هَلَكَتِ الرِّجَالُ حِيْنَ اَطَاعَتِ النِّسَاءَ (مستدرك حاكم)

পুরুষরা যখন নারীদের আনুগত্য শুরু করে, তখন তার পরিণতি ধ্বংস ছাড়া আর কিছু হয় না।

আরও অধিক সুস্পষ্ট ভাষায় রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا اَمْرَهُمْ اِمْرَأَةً (بخارى)

যে জাতি তাদের জাতীয় ও সামষ্টিক বিষয়াদি সমর্পণ করে তাদের নারীদের ওপর, সে জাতি কখনও কল্যাণ লাভ করতে পারে না।

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম শওকানী বলেছেনঃ

'এই হাদীস থেকে জানা গেল, নারী জাতীয় নেতৃত্ব ও সরকারী দায়িত্ব পালনের যোগ্য নয়। নারীকে কোন জাতির নেত্রী বানানো জায়েয নয়। কেননা অকল্যাণ ও ক্ষতি হয় যে কাজে, তা অবশ্যই পরিহার্য।' –নাইলুল-আওতার

ইসলামে এ ব্যাপারে কোন দ্বিমতের অবকাশ নেই। কোন মুসলমানই এ বিষয়ে কোন ভিন্নমত গ্রহণ করতে পারে না। আল্লামা ইবনে হাজম এই পর্যায়ের যাবতীয় হাদীসের ভিত্তিতে লিখেছেনঃ

'মুসলমানদের মধ্যে যত দল-উপদলই থাক না কেন, তাদের কেউ-ই নারী নেত্রীত্বের যথার্থতায় বিশ্বাসী নয়।'

বস্তুতঃ নারীদের স্বাভাবিক দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতাই জাতীয় নেত্রীত্ব ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব থেকে তাদের অব্যাহতি দেয়ার এবং এই পদের জন্যে অনুপযোগী বিবেচিত হওয়ার আসল কারণ। ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলমানদের নেতা হওয়ার যোগ্য এমন ব্যক্তি, দ্বীন-ইসলামের মৌলিক ও খুঁটিনাটি বিষয়ে যার ইজতিহাদী যোগ্যতা ও প্রতিভা রয়েছে, এবং যিনি সমস্ত জাতীয় ও সামষ্টিক বিষয়াদি সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার-বিবেচনা, যুদ্ধ ও সন্ধি সংক্রান্ত জটিল বিষয়াদিতে বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টি প্রয়োগ এবং অতীব বীরত্ব ও সাহসিকতা সহকারে সম্মুখবর্তী যাবতীয় সমস্যার মুকাবিলা করার যোগ্যতার অধিকারী। আর এই পর্যায়ের জরুরী ও অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলী যে আল্লাহ্ তা'আলা কেবলমাত্র পুরুষদেরই দিয়েছেন–নারীদের দেননি, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। তবে এই যোগ্যতা নির্বিশেষে সব পুরুষের মধ্যেই রয়েছে, এমন কথা ইসলাম কখনও বলে নি।

জাতীয় নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব কার্যকরভাবে চালাবার জন্য যে-সব স্থানে গতিবিধি ও যাতায়াত জরুরী, সে সব স্থানে নারীর যাতায়াতই ইসলামে নিষিদ্ধ। যদি কেউ মনে করেন, নারীর মধ্যে স্বতঃই এই যোগ্যতা না থাকলেও তাকে এই পদে অভিষিক্ত করা হলে সে অনায়াসেই-যোগ্যতাসম্পন্ন পুরুষদের সহযোগিতা নিয়ে-দায়িত্ব পালন করতে পারে, তা হলে তার সে ধারণা যে নিতান্তই

অবিবেচনাপ্রসূত, একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করলেই তা বোঝা যাবে। বস্তুতঃ যার নিজের মধ্যে কোন কাজের মৌল যোগ্যতা নেই, সে অন্য লোকদের দ্বারা সেই কাজ যথার্থভাবে সুসম্পন্নও করাতে পারে না। কেননা যাদের দ্বারা এই কাজ সমাধা করানো হবে, মূল দায়িত্ব তাদের নয় বলে তারা দায়িত্বানুভুতি সহকারে সে কাজ করবে না। আর কর্তব্যনিষ্ঠা সহকারে যে কাজ করা হয় না, তা যথার্থভাবে সুসম্পন্নও হতে পারে না। উপরন্তু অন্য যোগ্য কর্মীদের দ্বারা সে কাজ করানো হলে কার্যতঃ সে কাজের দায়িত্ব তাদের ওপরই বর্তানো বাঞ্ছনীয়। অযথা একজন নারীকে শিখণ্ডীরূপে দাঁড় করিয়ে কোন সুফল বা কল্যাণ লাভের আশা করা একান্তই হাস্যকর।

দুনিয়ার যে-সব দেশে নারী নেতৃত্ব ও নারীর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সে সব দেশ ও জাতি যে কিছুমাত্র কল্যাণ লাভ করতে পারে নি; বরং চরম বিপর্যয়ের মধ্যে হাবুডুবু খেয়েছে, তা দুনিয়ার এ ধরনের যে কোন দেশ ও জাতির ইতিহাসই অকাট্যভাবে প্রমাণ করবে। আমাদের নিকটবর্তী দু'-একটি দেশ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে।

এখানে স্মর্তব্য, নারীর মধ্যে জাতীয় নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের যোগ্যতা না থাকলেও তারা যে কোন রকমেরই সামষ্টিক কাজের যোগ্য নয়, ইসলাম কিন্তু এমন কথা কখনও বলে নি। নারীদের স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্রের বাইরে এমন বহু সামাজিক ও সামষ্টিক কাজ রয়েছে, যে সবের দায়িত্ব নারীদের ওপর সহজেই অর্পণ করা যেতে পারে। আল্লামা ইবনুল হুম্মাম লিখেছেনঃ শরীয়াতে শুধু এতটুকুই বলা হয়েছে যে, নারীদের বিচার-বুদ্ধি কিছুটা কম। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তাদের কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করার আদৌ কোন যোগ্যতা নেই। তোমরা চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে,ওয়াক্ফ বিভাগের কার্যাবলী চালানোর দায়িত্বশীলতা, ইয়াতীমখানা পরিচালনা করার যোগ্যতা ইত্যাদি তাদের মধ্যে রয়েছে। –ফতহুল কাদীর

এ দৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে বলা যায়, নারী সামাজিক খেদমত বা সেবামূলক কর্মকান্ড চালাবার যোগ্যতার অধিকারী। এভাবে অনেক প্রকারের কাজের দায়িত্বই তাদের ওপর অর্পণ করা যেতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে, নারী স্বভাবতই যে কাজ করতে অসমর্থ, সেই ধরনের কোন কাজের দায়িত্ব তাদের ওপর কখনই চাপানো উচিত নয়। তাতে একদিকে যেমন সেই কাজের ক্ষতি হবে, তেমনি নারীর জীবনেও আসবে চরম অশান্তি ও ব্যাপক বিপর্যয়।

নারীদের ওপর সমাজ-সমষ্টির কোন কাজের দায়িত্ব দেয়া হলে কয়েকটি মৌলনীতি দৃঢ়তা সহকারে অবশ্যই পালন করতে হবে। কেননা শরীয়াতের

দৃষ্টিতে নারীর ব্যক্তিসত্তার নিরাপত্তা ও বিকাশ এবং সমাজের সাফল্য ও কল্যাণ এই নীতিসমূহের প্রতিপালনের ওপর নির্ভরশীল।

(১) এই পর্যায়ের প্রথম মূলনীতি হচ্ছে, নারীকে সর্বদা নিজের আসল অবস্থান-কেন্দ্রের ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন ও সতর্ক থাকতে হবে। আসলে নারী প্রকৃতিগতভাবেই সাংসারিক জীবনের নির্মাতা এবং তার ভাল-মন্দের জন্যে দায়ী। তার এই মর্যাদা (পজিশন) বিনষ্ট করে তার ওপর কোন কাজের দায়িত্ব দেয়ার অধিকার সমাজ বা রাষ্ট্র কারুরই নেই। তার নিজেরও অধিকার নেই এই মৌল দায়িত্বের কথা ভুলে গিয়ে এর পক্ষে ক্ষতিকর কোন কাজের ভার নিজের মাথায় তুলে নেয়ার। পারিবারিক ও সাংসারিক জীবন বিনাশ করে সমাজ-সমষ্টির কাজে নিজের যোগ্যতা-প্রতিভা ব্যয় করা শুধু তার নিজের পক্ষেই মারাত্মক নয়, সমাজ-সমষ্টির পক্ষেও তা নিরতিশয় ক্ষতিকর। কেউ নিজের প্রকৃত দায়িত্বের প্রতি অবহেলা করলে তার দ্বারা আসলে কোন দায়িত্বই পালিত হতে পারে না। পরন্তু নারীর মেধা ও কর্ম-শক্তি যদি অফিসে কলম পেশায় বা কারখানার চাকা ঘোরানোয় ব্যয়িত নাও হয়, তাহলে যে ক্ষতির আশঙ্কা করা যায়, তার চাইতে মানবতার অনেক বেশী ক্ষতি সাধিত হবে, যদি তার মেধা ও কর্মক্ষমতা সংসার জীবন নির্মানে নিয়োজিত না হয়। অফিস পরিচালনে তার সময় ব্যয়িত হতে গিয়ে যদি সংসার চালাতে এবং সন্তান ধারণ ও শিশু পালনের কাজ ব্যাহত হয়, তাহলে তা হবে বিশ্ব-মানবতার প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা।

(২) দ্বিতীয় মূলনীতি হচ্ছে স্বামীর অধীনতা ও আনুগত্য। ইসলাম যে সমাজ-পরিকল্পনা উপস্থাপন করেছে, তাতে পরিবার হচ্ছে প্রথম 'ইউনিট'। শৃংখলার প্রয়োজনে এই পরিবার ইউনিটের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব অর্পিত হয়েছে স্বামীর ওপর। কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ،

পুরুষরা নারীদের ওপর কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বসম্পন্ন।

কাজেই স্বামী স্ত্রীকে যে-সব সীমার মধ্যে রাখতে চাইবে তা যদি শরীয়াতের পরিপন্থী না হয়, তবে তা রাখার তার পূর্ণ অধিকার রয়েছে এবং সে অধিকার মেনে নেয়া স্ত্রীর কর্তব্য। পুরুষের জন্যে যে ধরনের স্ত্রী আল্লাহ্র অতি বড় নিয়ামতের নিদর্শন, সেই স্ত্রীর গুণ-বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ

اِنْ اَمَرَهَا اَطَاعَتْهُ،(ابن ماجة)

স্বামী তাঁকে যে কাজের আদেশ করবে, সে তা পালন করবে।

রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ 'যে স্ত্রী স্বামীর অবাধ্যতা করে–আদেশ অমান্য করে, তার নামায আল্লাহ্‌র নিকট কবুল হয় না।' বস্তুত পারিবারিক জীবনে স্ত্রীই হচ্ছে স্বামীর বড় সহায়। এই সহায়তা বাস্তবায়িত হতে পারে যদি স্ত্রী স্বামীর নিয়ন্ত্রণে জীবন যাপন করে। অন্যথায় পারিবারিক জীবনটাই ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। এই কারণে কোন ঈমানদার স্ত্রী ঘরে এমন কোন লোককেই যাতায়াত করার অনুমতি দিতে পারে না, যার আসাটা স্বামী পছন্দ বা সমর্থন করে না। অনুরূপভাবে তার ঘরের বাইরে যাওয়াকে স্বামী যদি সমর্থন না করে, তাহলে তার পক্ষে বাইরে যাওয়াও সমীচীন নয়। স্ত্রীলোকদের পক্ষে মসজিদে গিয়ে জামা'আতের সঙ্গে নামায পড়া শরীয়াতের দৃষ্টিতে অসঙ্গত নয়; কিন্তু তারা যেতে পারে যদি তাদের স্বামীগণ যাওয়ার অনুমতি দেয়। এই পর্যায়ে রাসূলে করীম (স) স্বামীদের সাবধান করে দিয়েছেন এই বলে যে, কারও স্ত্রী যদি মসজিদে গিয়ে নামায পড়ার অনুমতি চায়, তবে তার অনুমতি দেয়া উচিত, নিষেধ করা উচিত নয়। (মুসলিম) এর অর্থ, স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘরের বাইরে যেতে পারে না, তা মসজিদে নামায পড়ার জন্যে হলেও। এমনকি কোন স্ত্রীর ওপর হজ্জ ফরয হওয়া সত্ত্বেও তার স্বামীর অনুমতি না পেলে কোন মুহাররাম পুরুষ সঙ্গী ছাড়া সে হজ্জ করতেও যেতে পারবে না। (বায়হাকী)। তবে কতকগুলো ব্যাপারে স্বামীর অনুমতি ছাড়াই স্ত্রী ঘরের বাইরে যেতে পারে। যেমন, সে যে-ঘরে বাস করছে, সে ঘর ভেঙে পড়ার উপক্রম হলে বা সেখানে জীবন বিপন্ন হয়ে পড়লে, শরীয়াতের কোন মাসলা জানবার জন্যে কোন বিশেষজ্ঞের নিকট যেতে হলে, কোন মুহাররাম পুরুষের সঙ্গে ফরয হজ্জ পালনে যেতে হলে, পিতা-মাতার বা মুহাররাম নিকটাত্মীয়কে দেখবার জন্যে যেতে হলে স্ত্রী স্বামীর অনুমতির মুখাপেক্ষী হবে না।

এ সব কথার অর্থ, স্ত্রীকে দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব-কর্তব্য এবং আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র বান্দাহদের অধিকার-এই দুয়ের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য রেখে চলতে হবে। যেখানে এই দুটির মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হবে, সেখানে কম গুরুত্বপূর্ণ কাজের পরিবর্তে বেশী গুরুত্বপূর্ণ কাজটিই তাকে করতে হবে। এটা তার ব্যক্তিগত দায়িত্ব। যে-সব কাজের জন্যে প্রত্যক্ষ ও সরাসরিভাবে সমাজ-সমষ্টি দায়ী, ব্যক্তিদের ওপর তার দায়িত্ব প্রত্যক্ষ নয় পরোক্ষ, সে সব কাজের তুলনায় যে-সব কাজ ব্যক্তিগতভাবে তার ওপর অর্পিত, সে সব কাজের দিকেই তাকে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে। এ কথাও সাধারণ অবস্থার জন্যে। কিন্তু জরুরী অবস্থা দেখা দিলে নারীর ওপর যদি কোন কাজের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব আসে, তবে তখন সে স্বামীর অনুমতি ব্যতীতই ঘরের বাইরে যেতে পারে। কিন্তু সাধারণ অবস্থায়

এরূপ করার তার অধিকার নেই। কেননা এ সময় স্বামীর প্রতি কর্তব্যই স্ত্রীর প্রধান করণীয়। অনুরূপভাবে স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে স্ত্রী কামাই-রোজগার পর্যায়ের কোন কাজে বাইরে যেতে পারে না। কেননা কামাই রোজগার তার কর্তব্য নয়। মূলতঃ ভরণ-পোষণের সমস্ত দায়িত্ব স্বামীর। তবে স্বামী যদি ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন না করে বা করতে অক্ষম হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী রোজগারের জন্য ঘরের বাইরে যেতে ও চেষ্টা-শ্রম করতে পারে। ঘরের খরচ-পত্রের বাড়তি প্রয়োজন পূরণের জন্যে স্ত্রী যদি ঘরে বসেই কোন কাজ করে, তাহলে তাও সে অনায়াসে করতে পারে। এ পর্যায়ে মৌলিক কথা হলঃ

> 'যে সব কাজে স্বামীর অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিংবা অধিকার সঙ্কুচিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, সে সব কাজ করার কিংবা সে ধরনের কাজে ঘরের বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে স্বামী স্ত্রীকে বাধা দিতে পারে। কিন্তু যে সব কাজে তা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, সে সব কাজে বাধা দেয়ার কোনই কারণ নেই।'
>
> –দুররুল মুখতার

এ প্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠতে পারে, স্ত্রী স্বামীর অধিকার যথাযথ ও পুরাপুরি আদায় করার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের বাইরে বিভিন্ন তৎপরতায় নির্বাধে অংশ নিতে পারবে কি না? আমাদের মতে এই প্রশ্ন অযৌক্তিক। কেননা, শরীয়াত তো এই দুই ধরনের কাজের মধ্যে পার্থক্য করেছে। শরীয়াতের দৃষ্টিতে ঘর হল স্ত্রীর প্রধান কর্ম-কেন্দ্র এবং তার দ্বীন ও নৈতিকতার আশ্রয়-স্থল। ঘরের বাইরের তৎপরতায় নির্বাধে অংশ গ্রহণে এই সব দিক দিয়ে তার বিপন্ন হওয়া অসম্ভব নয়। এই কারণেই নবী করীম (স) বলেনঃ

اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطٰنُ (ترمذى)

নারী গোপন করে রাখার যোগ্য। সে যখন বাইরে যায়, তখন শয়তান তার ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

হযরত উমর ফারুক (রা) বলেছেনঃ "নারী প্রচ্ছন্ন রাখার বস্তু। তাকে তোমরা লুকিয়েই রাখবে।"–উয়ূনুল আখবার

এ সব কথার পশ্চাতে একটা মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব নিহিত রয়েছে। ইসলাম দাম্পত্য জীবনকে দৃঢ়বদ্ধ দেখতে চায়। কিন্তু এই বন্ধন এতই নাজুক ও ঠুনকো যে, যে-কোন ধাক্কায় তা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে। এই বন্ধনের নিরাপত্তার খাতিরেই কোন সচেতন ও বুদ্ধিমান স্বামী তার স্ত্রীর যথেচ্ছ বিচরণ ও যখন-তখন বাইরে যাতায়াত বরদাশত করতে পারে না। কেননা তাতে স্ত্রীর পক্ষে নানা

প্রকার বিপদ-আপদে ও জটিলতায় জড়িয়ে পড়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। স্ত্রী যদি যুবতী হয় এবং দেখতে শুনতে হয় সুন্দরী ও আকর্ষণীয়া, উপরন্তু স্বামী হয় ভদ্র চরিত্রসম্পন্ন, তাহলে তো কথাই নাই। -ফতহুল কাদির

(৩) তৃতীয় মূলনীতি হচ্ছে, পর-পুরুষের সাথে নারীদের অবাধ মেলামেশা ও সংমিশ্রণ পরিহার করতে হবে। পূর্ববর্তী আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, স্বামীর অনুমতিক্রমে ঘরের বাইরে শিক্ষাগত, দ্বীনী ও সামাজিক কার্যাবলী আঞ্জাম দেয়া স্ত্রীর জন্য সম্পূর্ণ জায়েয। কিন্তু ইসলামী শরীয়াত তাদেরকে পর-পুরুষদের সাথে অবাধে মেলা-মেশা করার একটুও অনুমতি দেয়নি; বরং তাদের ও ভিন্ পুরুষদের মাঝে নৈতিকতা এবং আইনের একটা প্রাচীর দাঁড় করে দিয়েছে। নারীদের বাইরে চলা-ফেরার ব্যাপারে ইসলামের এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থার একটা বড় কারণ এই যে, পর-পুরুষদের সাথে অবাধ মেলামেশার ফলে তাদের নৈতিক চরিত্র কলঙ্কিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কোন নারী খোদার কায়েম করা এই প্রাচীর চূর্ণ বা লংঘন করে বাইরে চলাফেরা করলে সে পদে পদে খোদাদ্রোহিতা ও নাফরমানীতে নিমজ্জিত হবে। আর এটা নারী ও সমাজ উভয়ের জন্যেই অত্যন্ত মারাত্মক হয়ে দেখা দেবে। এই কারণে শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, সভ্যতা-সংস্কৃতি কিংবা রাজনীতি, দেশরক্ষা-প্রতিটি ক্ষেত্রে গায়র-মুহাররম নারী-পুরুষের অবাধ সংমিশ্রণ পূর্ণ শক্তিতে প্রতিরোধ করা দরকার। ইসলামে পুরুষ দর্শকদের সম্মুখে মেয়েদের নাচ-গান করার যেমন অবকাশ নেই, তেমনি একই শ্রেণীকক্ষে পাশা-পাশি বা সামনা-সামনি বসে লেখাপড়া করার, শিক্ষকের লেক্চার শোনার ব্যবস্থা ইসলামী সমাজে সম্পূর্ণ অচল। কোন মুসলিম নারী ভিন্ পুরুষের সাথে একত্রে না সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে, না কোন মিশ্র তৎপরতায় অংশ গ্রহণ করতে পারে। এই ধরনের কোন ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় শরীক হতে পারে কেবলমাত্র সে সব রমণী, যাদের আল্লাহ্-রাসূল ও পরকালের প্রতি একবিন্দু ঈমান নেই-নেই লজ্জা-শরমের বালাই। বাজার-বিপনী থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পরিষদ ও জাতীয় পরিষদ পর্যন্ত গায়র মুহাররাম নারী-পুরুষের অবাধ সংমিশ্রণের সামান্যতম অবকাশ ইসলামী সমাজে নেই।

নবী করীম (স)-এর সময়ে তাঁর ভাষণ শুনবার জন্যে মহিলারাও উপস্থিত হতেন। কিন্তু তারা একত্রিত হয়ে পাশাপাশি বসতেন না কখনও। তাদের বসার স্থান পুরুষদের থেকে সব সময় ভিন্ন ও স্বতন্ত্র হত। ঈদের নামাযেও এরূপ ব্যবস্থাই কর্যকর হত। এখনকার মত তখন মাইক্রোফোনের ব্যবস্থা ছিল না বলে নবী করীম (স) পুরুষদের সামনে একবার ভাষণ দিতেন, পরে আবার ভাষণ দিতেন মহিলাদের সমাবেশে। নবী করীম (স) দায়েরকৃত মামলায় বিচারের

জন্যে মহিলা আসামীকে বিচার স্থানেও উপস্থিত করতেন না। বিচারালয় থেকে মেয়েদের দূরে রাখার স্পষ্ট নির্দেশও রয়েছে এই কারণে।

নবী করীম (স)-এর সময়ে নারীদের যথারীতি সামরিক শিক্ষা না দেয়া হলেও তখনকার নারীরা বিশেষ পরিবেশ ও সংগ্রামী জীবন ধারার প্রভাবে সব সময়ই সামরিক কার্যাদি সুসম্পন্ন করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। একালেও প্রয়োজন বোধে ইসলামী রাষ্ট্র নারীদের সামরিক ট্রেনিং দিয়ে তাদের যোগ্যতা-প্রতিভা কাজে লাগাতে পারে। কিন্তু তাতে এ শর্ত অবশ্যই থাকতে হবে যে, পুরুষদের সাথে তাদের অবাধ মেলামেশার সুযোগ দেয়া চলবে না। খোদ নবী করীম (স) তাঁর বেগম হযরত আয়েশা (রা)-কে যুদ্ধের ময়দানে সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন এবং তিনি নিজেই তাঁকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। সেক্ষেত্রে তিনি অপর পুরুষদের সাথে কোনরূপ অবাধ মেলামেশার সুযোগ ঘটতে দেননি।

প্রশ্ন উঠতে পারে, মেয়েদেরকে সামরিক বিভাগে নিযুক্ত করা হলে তাদেরকে পুরুষদের সাথে অবাধ মেলামেশা থেকে দূরে রাখতেই হবে, শরীয়াতে কি তার খুব বেশী তাকীদ রয়েছে? রাসূলের যুগেও যখন নারীরা পুরুষদের সাথে একত্রিত হয়ে যুদ্ধ করেছে, তখন নারী-পুরুষের মেলামেশা নিশ্চয়ই ততটা নিষিদ্ধ নয়?

এর জবাব এই যে, বিচ্ছিন্ন দু'-একটা ঘটনাকে কখনও নীতি বলা চলে না। সাধারণ নিয়মই হচ্ছে নীতি। বিশেষ কোন সময়ে কোন অসাধারণ সমস্যার কারণে কোন কাজ করা হয়ে থাকলে তা কখনই সাধারণ নিয়ম হতে পারে না। বিশেষ সময়ে বিশেষ অবস্থার কারণে বা প্রয়োজনে কোন কাজ করা হলে তার ভিত্তিতে স্থায়ী নিয়ম তৈরি হতে পারে না। কেননা, বিশেষ ধরনের কর্মপন্থা গ্রহণের অনুমতি শরীয়াতে থাকতে পারে। সাধারণ অবস্থায় সেই অনুমতি সম্পূর্ণ অচল বলে মনে করতে হবে।

যুদ্ধ ভয়ঙ্কর রকমের একটা আপতিক ঘটনা। তাতে কোন ব্যক্তিকে নয়, গোটা জাতিকেই জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়াতে হয়। তখন সাধারণ ও শান্তিকালীন স্থায়ী নিয়ম-নীতি যথাযথভাবে পালন করা কঠিন বা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাছাড়া যুদ্ধ-বিগ্রহ নিতান্তই জরুরী পরিস্থিতি আর জরুরী পরিস্থিতিকে সাধারণ শান্তিকালীন অবস্থার সাথে তুলনা করা চলে না। নবী করীম (স)-এর যুগে মুসলিম মহিলাদেরও গায়র-মুহররাম পুরুষদের পাশে থেকে একত্রে ময়দানে লড়াই করতে হয়েছে, তা ইতিহাসের কথা; কিন্তু তা কখনই সাধারণ অবস্থায় অনুসৃত নীতি ছিল না।

তাছাড়া যুদ্ধ স্বতঃই সাধারণ অবস্থাকে বিপর্যস্ত করে দেয়। অনেক সময় তা এতই ব্যাপক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ও ভয়াবহ রূপে দেখা দেয় যে, তখন প্রতিটি মানুষ তাতে বিচলিত হয়ে পড়ে। নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারও তখন অত্যন্ত কঠিন হয়ে দেখা দেয়।

রাসূলে করীম (স) ও সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে তখন যুদ্ধ-সংগ্রামে অনুরূপ পরিস্থিতিরই সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তখনও মুসলমানদের জাতীয় স্থিতি ও রাষ্ট্রীয় সংহতি সুদৃঢ়ভাবে গড়ে উঠতে পারেনি। এ সত্ত্বেও তাঁদের যুদ্ধ-সংগ্রামের এক অসহ ও অশেষ পরিস্থিতির মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। সামরিক সাজ-সরঞ্জাম বলতে তাদের কিছুই ছিল না; সেই সঙ্গে জনশক্তিও ছিল এতই স্বল্প ও সামান্য যে, এ নিয়ে যুদ্ধে যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এই কারণে তখন আপন স্ত্রী-কন্যা-বোনদেরকে যুদ্ধে নিয়ে যাওয়া ছাড়া কোন উপায়ই ছিল না তাদের। এই কারণে সেকালের সেই সঙ্কটপূর্ণ সময়ে মুসলিম নারীদেরও যুদ্ধে যেতে হয়েছে এবং যার দ্বারা যতটুকু সামরিক কাজ সম্ভব ছিল, তা করানো হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধে নারীদের এই যোগদানকেও যতদূর সম্ভব নিয়ন্ত্রিত রাখা হয়েছে। প্রয়োজনের প্রান্তিক সীমার বাইরে তাকে যেতে দেয়া হয়নি কখনই। নারীদের যুদ্ধে যোগদানের আগে তাদের সার্বিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হত সর্বাগ্রে। পাইকারী হারে তাদের ডেকে ডেকে যুদ্ধে শরীক করা হত না; তাদের কোনরূপ প্রলুব্ধও করা হত না। তাই বড় বড় যুদ্ধেও খুব স্বল্প সংখ্যক নারীই যোগ দিয়েছেন বলে জানা যায়। যুদ্ধ ক্ষেত্রে বাস্তবিকই প্রয়োজন রয়েছে কি না, তা সূক্ষ্মভাবে বিচার-বিবেচনা করেই একজন নারীকে যুদ্ধে যোগদানের অনুমতি দিতেন নবী করীম (স)। এক যুদ্ধে কতিপয় মহিলা তাদেরই ঘরের পুরুষদের সঙ্গে যুদ্ধে যোগদানের জন্যে উপস্থিত হলে নবী করীম (স) খুবই অপ্রসন্ন হলেন এবং তাদের লক্ষ্য করে বললেনঃ

مَعَ مَنْ خَرَجْتُنَّ وَ بِإِذْنِ مَنْ خَرَجْتُنَّ (مسند احمد)

তোমরা কাদের সঙ্গে বের হয়ে এসেছ এবং কার অনুমতি নিয়ে তোমরা ঘর থেকে বের হলে?

এক কথায় বলা যায়, যে নারীই তখন যুদ্ধে যোগদান করতেন, নিজেদের অতি আপনজনের সঙ্গে একত্রিত হয়ে যোগ দিতেন এবং সর্বোপরি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট থেকে ব্যক্তিগতভাবে অনমুতি না পাওয়া পর্যন্ত কোন নারী যুদ্ধে যোগ দিতে পারতেন না। এর বিপরীত হলে অর্থাৎ এ দুটি নিয়ম লংঘন করলে কারুর পক্ষেই যুদ্ধে যোগদান সম্ভবপর হত না। তাছাড়া যুদ্ধের ময়দানে তাদের

কর্মক্ষেত্র হত নিতান্ত আপনজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কোথাও গায়র-মুহাররাম পুরুষদের সাহচর্যের ব্যাপার ঘটলেও তখন অবাধ মেলামেশা সর্ব প্রযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হত। তারা প্রয়োজনের সময় আপনজনেরই সেবা-শুশ্রূষা ও খেদমত করতেন।

ইমাম নববী এ পর্যায়ে লিখেছেনঃ

وَهٰذِهِ الْمُدَاوَاةُ لِمَحَارِمِهِنَّ وَ اَزْوَاجِهِنَّ وَ مَاكَانَ مِنْهَا لِغَيْرِهِمْ لَا يَكُوْنُ فِيْهِ مَسُّ بَشَرَةٍ اِلَّا فِىْ مَوْضِعِ الْحَاجَةِ۔(نبوى شرح مسلم)

নারীদের এই সেবা-শুশ্রূষা ও চিকিৎসা ইত্যাদি ছিল তাদের মুহাররাম আত্মীয়-স্বজন ও স্বামীদের জন্যে এবং তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর তাদের ছাড়া অন্যদের চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষার কাজ যা কিছু হত, তাতে সাধারণত দৈহিক স্পর্শ হত না-অবশ্য নিতান্ত প্রয়োজন দেখা দিলে সেই নির্দিষ্ট স্থান স্পর্শ করা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা।

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রয়োজন দেখা দিলে—অত্যন্ত কঠিন সঙ্কটপূর্ণ বা জরুরী অবস্থা দেখা দিলে-মুসলিম নারীরা পূর্বোক্ত সীমার মধ্যে থেকে নিজেদের দ্বীন ও দেশরক্ষার জন্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চেষ্টা চালাতে পারেন, ইসলামী শরীয়াতের এই হচ্ছে স্থায়ী বিধান।

এই পর্যায়ে একটি জরুরী কথা এই যে, মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রে পাশ্চাত্য সমাজ দর্শনের অনুসরণে নারীদের কোনরূপ অশ্লীল, উচ্ছৃঙ্খল ও নগ্ন তৎপরতায় লিপ্ত হওয়া কিংবা তাদের ঘর থেকে টেনে বের করে এনে পুরুষদের মধ্যে একাকার করে দিয়ে এক নির্লজ্জ পরিবেশের সৃষ্টি করা কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয়। কেননা ইসলামী সমাজ ও নারী দর্শনের সাথে পাশ্চাত্য জীবন দর্শনের এতটুকু সাযুজ্য নেই। এ দুয়ের মাঝে রয়েছে মৌলিক পার্থক্য। পাশ্চাত্য দর্শন খোদাদ্রোহীতা আর ইসলামী সমাজ খোদাপরতার উপর প্রতিষ্ঠিত, এই দুয়ের মধ্যে সমতা সৃষ্টির চেষ্টা ইসলামের প্রতি চরম শত্রুতা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। পাশ্চাত্য সমাজ নারীদের যে স্বাধীনতা দিয়েছে, তার সাথে ইসলামের দেয়া স্বাধীনতার কোন তুলনাই হতে পারে না। ইসলাম নারীদের যে দিকে নিয়ে যেতে চায়, পাশ্চাত্য চিন্তা-দর্শন তাদের নিয়ে যাচ্ছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে। ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলিম নারীর প্রথম, প্রধান ও আসল কর্মকেন্দ্র হচ্ছে তার ঘর। আর পাশ্চাত্য দর্শনে নারী হচ্ছে বারবনিতা, নাচ ঘরের নর্তকী, কারখানার শ্রমিক এবং পুরুষদের লালসা চরিতার্থের উপকরণ মাত্র। ইসলাম নারীদের

জন্যে যে কর্ম-বিধি নির্ধারণ করেছে তাদের মর্যাদা ও পবিত্রতা রক্ষার জন্যে, পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে তাতে নাকি নারীর অপমান।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, নবী করীম (স) ও খুলাফায়ে রাশেদুনের যুগে মুসলিম সমাজ বহু সামরিক ও রাজনৈতিক সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছে। এ সবের সমাধানের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব কখনও কোন নারীর উপর অর্পন করা হয়নি। কতই না যুদ্ধ সংঘটিত হল, কিন্তু কোন যুদ্ধের সেনাধ্যক্ষ হয় নি কোন নারী। সে যুগে ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরের দায়িত্ব পালনের জন্যে নিয়োজিত হয়েছে কত নারী। তবুও কোন একজন সুশিক্ষিতা ও যোগ্যতাসম্পন্ন নারী সাহাবীকে কোন এলাকার গভর্নর বা প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়নি। অর্থ বিভাগ বা বিচারকার্য পরিচালনার জন্যেও কোন নারীকে নিযুক্ত করা হয়নি। রাসূলে করীম (স)-এর ইন্তেকালের পর কোন নারী সাহাবীকে খলীফাও বানানো হয়নি।

নবী করীম (স) ও খুলাফায়ে রাশেদুনের আমলে মুসলমানদের সমাজ ব্যবস্থা কুরআন-ভিত্তিক ছিল এবং তা-ই দুনিয়ার মুসলমানদের জন্যে চিরন্তন আদর্শ। বর্তমান পাশ্চাত্য সমাজ মুসলমানদের জন্যে কখনই অনুসরণীয় হতে পারে না এবং তা অনুসরণ করতে গিয়ে নারীদের ঘর থেকে টেনে বের করে এনে পুরুষদের মাঝে একাকার করে দেয়ার অধিকারও কারুরই নেই। পাশ্চাত্য সমাজে নারীদের শুধু ঘর থেকেই টেনে বের করা হয়নি, নারী-পুরুষের মাঝে ঠিক জীব-জন্তুর ন্যায় অবাধ যৌন সম্পর্ক স্থাপনের সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়েছে। তার ফলে মানব সমাজে যে সর্বাত্মক বিপর্যয় নেমে এসেছে, তা এ কালের মানব জাতির পক্ষে সাংঘাতিকভাবে হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। সুস্থ বিবেক সম্পন্ন মানুষ অনতিবিলম্বে সাবধান না হলে অবশিষ্ট মূল্যবোধটুকুও খড়কুটোর মত ভেসে যাবে, তাতে একবিন্দু সন্দেহ নেই।

মৌলিক প্রশ্ন

নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্ক মানব জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং নিরতিশয় জটিল ব্যাপার। এই সম্পর্কের স্বরূপ কি-কি হওয়া বাঞ্ছনীয়, তা এক প্রাচীনতম প্রশ্ন। এই প্রশ্নের মধ্যে কেবলমাত্র যৌন লালসা ও প্রবৃত্তির চরিতার্থতারই ব্যাপার জড়িত নয়, বংশ-রক্ষার ব্যাপারটিও গভীরভাবে সম্পৃক্ত। কেননা যৌন সম্পর্ক ছাড়া এই দুটি সমস্যার সমাধানের স্বভাবসম্মত পন্থা আর কিছু হতে পারে না। প্রাচীন কালের লোকেরা যৌন কামনা সম্পর্কে নানারূপ ভুল ধারণার মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। অনেকে মনে করত, এই কামনাটা একটা অদৃশ্য শক্তি এবং মানুষের জীবন ও মৃত্যু-এর ওপর নির্ভরশীল। অনেক মানুষ নিজেদেরকে এই শক্তির সম্মুখে নিতান্ত অসহায় মনে করত। এক কালের মানুষ যৌনশক্তি ও প্রবৃত্তির তাড়নাকে এক দৈব শক্তির প্রভাব বলে বিশ্বাস করত এবং তার কবল থেকে নিজেদের বংশধরদের দূরে সরিয়ে রাখার জন্যে তার সন্তুষ্টি বিধানকে অপরিহার্য বলে মনে করত। এমনকি এ উদ্দেশ্যে তারা এই শক্তির প্রতিমূর্তি নির্মাণ করে এই শক্তির পূজা-উপাসনায় লিপ্ত হতে শুরু করেছিল। অনেক গোত্র যৌন অঙ্গের আকার-আকৃতি বানিয়ে তারই পূজা করত। কেননা তারা মনে করত, বংশ রক্ষার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে এই অঙ্গ। অতএব যৌনাঙ্গের ভিতরে ঐশ্বরিক শক্তি নিহিত রয়েছে। অনেক জাতির জাতীয় উৎসব-অনুষ্ঠানে যৌন অঙ্গের প্রকাশ ঘটানো হত। দুনিয়ার কোন কোন ধর্মে যৌনপ্রবৃত্তির পূজা একটা গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান রূপেই গণ্য হত।

এই সবের মূলে লোকদের বংশ রক্ষার বাসনাটাই প্রবলভাবে কাজ করেছে। তারা বংশ রক্ষার প্রয়োজন মনে করত এজন্যে যে, জীবন সংগ্রামে বংশধররাই তাদের উপযুক্ত সঙ্গী ও সহকারী হতে পারে বলে তারা বিশ্বাস করত। শত্রুর মুকাবিলায় দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্যে যে শক্তি অপরিহার্য, তা তারা এই উপায়েই সংগ্রহ করত। এই পর্যায়ে তারা নানারূপ জটিল প্রশ্নের জবাব খুঁজত। ভূমিষ্ট সব শিশুকেই তারা রক্ষা করবে, না কেবলমাত্র কাজে আসতে পারে এমন সন্তানদের বাঁচাবে ও লালন-পালন করবে, এটা ছিল তাদের কাছে এক জটিল প্রশ্ন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, ভূমিষ্ঠ শিশুদের লালন-পালনের দায়িত্ব কে নেবে? এ দায়িত্ব কি কেবল নারীর অর্থাৎ মায়ের? কিংবা পুরুষদের? অথবা নারী-পুরুষ উভয়ের?

তাছাড়া জীবন-জীবিকা, ধন-মাল ও দ্রব্য-সামগ্রী বিলি-বন্টনের ব্যাপারটিও তাদের জন্যে বিশেষ সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছিল। এসব প্রশ্নই অধিকতর ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি লাভ করে অবশেষে গোত্র, জাতি ও রাষ্ট্রের রূপ নেয়। আর এভাবেই প্রাচীন লোকদের সামাজিক সংস্থা গড়ে উঠত। তাদের গোত্রীয় জীবন কখনও কখনও মাকে কেন্দ্র করে প্রবর্তিত হয়েছে। তখন পিতা শ্রম-মেহনত করে জীবিকা উপার্জন করত। আর মা পূর্ণ মালিকানা-কর্তৃত্ব নিয়ে সন্তান ও পরিবারের অন্যান্য লোকজনের জন্যে তা ব্যয় করত। সন্তানরা তখন মায়ের নামেই পরিচিত হত। আবার কোথাও পিতাই হত পরিবারের সর্বেসর্বা—একচ্ছত্র কর্তা। গোটা পরিবারের ওপর পিতার নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হত। অনেক সমাজে আবার পিতামাতা উভয়ই মিলিতভাবে যাবতীয় পারিবারিক দায়-দায়িত্ব পালন করত ও সমস্যার সমাধান খুঁজত।

এভাবে পারিবারিক সমস্যার সমাধানের বিভিন্ন রূপের সঙ্গে সঙ্গে যৌন সম্পর্কের রূপও পরিবর্তিত হয়ে যায়। কোথাও এই সম্পর্ক হত সাময়িক বা ক্ষণিকের জন্যে। কোথাও তা স্থায়ী বন্ধন হয়ে থাকত। অনেক জাতি সেজন্যে নানাবিধ নিয়ম-নীতি ও সীমা নির্দিষ্ট করে রেখেছিল। কোথাও তা নারী-পুরুষের ইচ্ছা ও সম্মতির ওপর নির্ভরশীল হত। আবার কোথাও ছিল একক বিয়ের প্রচলন-অর্থাৎ এক স্বামী, এক স্ত্রী। কোথাও একজন স্ত্রীর সাথে পরিবারের সব পুরুষেরই যৌন সম্পর্ক স্থাপনের নিয়ম চালু ছিল। আবার কোথাও এক স্বামী বহু স্ত্রী গ্রহণ করত। মোটকথা, মানব ইতিহাসে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ এমনও অতিবাহিত হয়েছে, যখন বিয়ে ও পারিবারিক জীবনের কোন ধরাবাঁধা নিয়ম-নীতি কার্যকর ছিল না।

পারিবারিক জীবন সংস্থার এই বৈচিত্রের মূলে কোন অর্থনৈতিক কার্যকারণ ছিল না। যৌন প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ সংস্থা গড়ে তোলা হয়েছে মাত্র। বস্তুতঃ যৌন কামনা-বাসনা অত্যন্ত তীব্র ও প্রকট বলেই এর পরিতৃপ্তির জন্যে সামাজিক স্বার্থ রক্ষার দিকে তেমন কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। যৌন কামনাই বরং সামাজিক দাবির ওপর বিজয়ী হয়েছে অনেক সময়। ফলে সমাজকে অনেক সময় তদ্দরুণ কঠিনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে। মানুষের জীবনে শান্তি ও স্বস্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। নিয়ম-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার পরিবর্তে চরম দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ ও স্বেচ্ছাচারমূলক কার্যকলাপের প্রসার ঘটেছে। মারামারি, কাটাকাটি ও যুদ্ধবিগ্রহ প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। এক কথায় বলা যায়, যৌন লালসা নিবৃত্তির আবেগে মানুষের সামাজিক ও তামাদ্দুনিক জীবন দুঃসহ বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে।

বৈরাগ্যবাদ

এইরূপ অবস্থায়ই দেখা দিয়েছে বৈরাগ্যবাদ। চারদিকে যৌন-উচ্ছৃংখলতার সয়লাব লক্ষ্য করে এক-শ্রেনীর মানুষ বিবাহ ও পরিবার জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পরেছে। নারী পুরুষ একে অন্যের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের পরিবর্তে একে সম্পূর্ণ বর্জন করে চলবার প্রবণতাও ব্যাপক হয়ে দেখা দিয়েছে। যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ নয়, বরং তাকে কঠোরভাবে দমন করতে দুঃসহ কৃচ্ছ্রসাধনায় লিপ্ত হয় মানুষ। গোটা খৃস্ট ধর্ম উত্তর কালে এই বৈরাগ্যবাদী নীতির উপর সংস্থাপিত হয়। পূঁতিগন্ধময় আবর্জনা পরিহার করার মতই ধর্মে বিশ্বাসী লোকেরা যৌন সম্পর্ককে সম্পূর্ণ বর্জন করে চলতে শুরু করে দেয়। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি বিদ্বেষ, বিতৃষ্ণা ও অনাশক্তি তখন এতই প্রবল হয়ে দেয়া দেয় যে, খৃস্টধর্মে দীক্ষিত লোকেরা নিজেদের গর্ভধারণকারী মা এবং সহোদরা বোনদের সাথেও সাক্ষাত করতে চাইত না। গোটা মানবতাকে যেন বৈরাগ্যবাদের এই ব্যাধি অক্টোপাশের মত আকড়ে ধরেছিল। কেবল খৃস্ট ধর্মই নয়, অন্যান্য অনেক ধর্মমতই এই বৈরাগ্য নীতিকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিল।

লক্ষনীয় বিষয় এই যে, এ সব ধর্মে যৌন কামনা-বাসনার চরিতার্থের কোন ভারসাম্যপূর্ণ বিধান নেই। যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা রোধ করার কোন সুষ্ঠু নীতি বা আদর্শই দিতে পারেনি এসব ধর্ম; বরং তাতে যৌন প্রবৃত্তি ও যৌন সম্পর্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শিক্ষা রয়েছে। অথচ যৌন প্রবৃত্তি অবদমিত করে রাখা সম্ভব নয়। যৌন সম্পর্ক পরিহার করা মানব স্বভাব ও প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ ধর্মগুলো তা-ই করতে চেয়েছে বলেই উত্তরকালে এসব ধর্মে বিশ্বাসী লোকদের মধ্যে চরম উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়েছে স্বাভাবিকভাবে। বস্তুতঃ স্বাভাবিক যৌন প্রবৃত্তি ও সম্পর্কের পথে যেখানেই প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয়েছে, সেখানেই তার তীব্র প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অবৈধ পন্থায় এর চরিতার্থতার প্রবণতা ব্যাপক হয়ে দেখা দিয়েছে। খৃস্ট ধর্মের অন্যতম প্রধান দিকপাল গ্রেট পোপ জন পর্যন্ত নিজের সহোদরা বোনের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে। কাটার বারির পুরোহিত ১১৭১ সনে কেবল একটি মাত্র স্থানেই ১৭টি অবৈধ সন্তানের পিতা রূপে চিহ্নিত হয়েছে। স্পেনের একজন খৃস্টান পুরোহিত ১৯৩০ সনে ৭০ জন মেয়ে দাসীকে নিজের যৌন সঙ্গিনী রূপে ব্যবহার করেছে। তৃতীয় হেনরীর পাদ্রী ১২৭৪ সনে ৬০ টি অবৈধ সন্তানের জন্মদাতা ছিল। এভাবে খৃস্টান পাদ্রীদের উপাসনালয়গুলো খোদার উপাসনা স্থলের পরিবর্তে ব্যভিচারের লীলা-কেন্দ্রে পরিণত হয়। ব্যভিচার প্রবণতা তাদের এতই সীমালংঘন করে যে, তাতে আপন-পর, রক্ত সম্পর্ক এবং মুহাররাম ও গায়ের মুহাররামের কোন পার্থক্যও তারা রক্ষা করেনি। এ কারণে

খৃস্ট ধর্মে পাদ্রীদের জন্যে বার বার এই বিধান জারী করতে হয়েছে যে, তারা যেন নিজেদের মা ও বোনদের কাছেও না যায়। বস্তুতঃ খৃস্ট ধর্মের প্রচারকরাই এইসব অপকর্মে অধিক পটু ও পারদর্শী বলে প্রমাণিত হয়েছে। দ্বাদশ শতকে একজন পাদ্রী ইংলণ্ডে ধর্ম প্রচারে গমন করে। দীর্ঘক্ষণ ওয়াজ-নসীহত করার কয়েক ঘন্টা পরই তাকে একটি বেশ্যার ওপর যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জঘন্য কাজে লিপ্ত দেখা যায়। আসলে এ হচ্ছে বৈরাগ্যবাদের প্রতিক্রিয়া। পাদ্রীদের জন্যে বিয়ে নিষিদ্ধ হওয়ার অনিবার্য বিষাক্ত ফল।

বস্তুতঃ মানুষের মধ্যে যৌন কামনা চরিতার্থ করার যে স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে, কেবলমাত্র বিবাহের মাধ্যমেই তার নির্বিঘ্ন, শান্তিপূর্ণ ও বৈধ চরিতার্থতা সম্ভব। কিন্তু এই বিবাহ যদি বর্জিত হয়, তাহলে তার প্রতিক্রিয়া কেবল ব্যক্তি জীবনকেই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয় না, গোটা সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকেও বিদীর্ণ করে ফেলে। অনেক সময় স্বয়ং বিবাহ বর্জনকারী পুরুষ বা নারী দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা হারিয়ে সোজা পাগল হয়ে যায়। ১৯৫৭ সনে একদল বৃটিশ বিশেষজ্ঞ বহু সংখ্যক মানসিক ব্যধিগ্রস্ত লোককে এই বলে পরামর্শ দিয়েছিল যে, তোমরা যদি নানাবিধ মানসিক রোগ-ব্যধি থেকে রক্ষা পেতে চাও, তাহলে অবিলম্বে বিয়ে কর। জীব-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও বিয়ে নারী-পুরুষ উভয়ের সুস্থ জীবন যাপনের জন্যে একান্ত জরুরী। কিছুকাল আগে জাতিসংঘের ব্যবস্থায় দুনিয়ার সতেরটি দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ মিলিতভাবে গবেষণা চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এসব দেশের বিবাহিত নারী-পুরুষের বয়সের গড় ৫৭ বছর আর অবিবাহিত নারী পুরুষের বয়সের গড় মাত্র ৩৯ বছর। বিবাহিতা নারীরা সকলের তুলনায় অনেক বেশী বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকে।

বৈরাগ্যবাদী জীবন যাত্রা যৌন সম্পর্ক পরিহার করার মারাত্মক ক্ষতি কেবল ব্যক্তি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখে না, সামাজিক জীবনকেও তা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দেয়। লোকদের অপকর্ম ও চরিত্রহীন কার্যকলাপের পরিণামে যদি মহৎ ও পবিত্র সামাজিক সম্পর্কও কলঙ্কিত ও পঙ্কিল হয়ে যায়, তা হলে সব রকমের সামাজিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্কও বিনষ্ট ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।

বস্তুত যৌন স্পৃহা ও প্রবৃত্তিকে যদি কৃত্রিমভাবে বা কৃচ্ছ্র সাধনার পন্থায় অবদমিত করা হয়, তা হলে তার পরিণামে গোটা মানব সভ্যতাই দারুণ বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে যাবে এক অনিবার্য ও অপ্রতিরোধ্য পরিণতিরূপে। সামাজিক জীবন, সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যাওয়াও নিতান্তই অবধারিত।

অবিবাহিত জীবন যাপন যেমন স্বভাব-বিরুদ্ধ, তেমনি তা মানবতারও শত্রু। নারী ও পুরুষের মাঝে পারস্পরিক যে যৌন আকর্ষণ স্বভাবতঃই বিদ্যমান, তার চরম লক্ষ্য মানব বংশের ধারা অব্যাহত রাখা। অবিবাহিত জীবন এই লক্ষের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ আকর্ষণ স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করে যে, এখানে যারা বর্তমান বেঁচে আছে, বেঁচে থাকার অধিকার কেবল তাদেরই নয়, তাদের নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পরও মানবতার ধারাকে অব্যাহত রাখতে হবে। আর মানব বংশ অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যেই নারী-পুরুষের মধ্যে যৌন আকর্ষণ স্বাভাবিকভাবে রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু অবিবাহিত জীবন ধারা এবং যৌন সম্পর্ক স্থাপনে অস্বীকৃতি এই প্রকৃতিগত দাবির জবাবে যেন বলে দেয় যে, এই জমিনের ওপর আমার একার বোঝাই দুর্বহ। এই দাবি পূরণ করতে গিয়ে আমার আত্মাকে কেন অপবিত্র করব? মানবতার এই বাগান যদি উজাড়ও হয়ে যায়, তাতে আমার কি? আমিতো নিজেকে দুনিয়ার কাঁটায় জর্জরিত করতে পারি না।

অবাধ যৌন চর্চা

এই বৈরাগ্যবাদী নীতির পাশাপাশি আর একটি ভাবধারা আদিকাল থেকে চলে আসছে। তা হল অবাধ যৌন সম্পর্ক স্থাপনের নীতি। এই নীতির সার কথা হল, যৌন সম্পর্ক স্থাপনের দাবি যখন একটা স্বাভাবিক দাবি, তখন অপরাপর স্বাভাবিক দাবির ন্যায় এই দাবি পুরণেরও অবাধ ও উন্মুক্ত ব্যবস্থা ও সুযোগ-সুবিধা থাকা আবশ্যক। তাতে ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য বা হালাল-হারামের কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। সেরূপ প্রশ্ন উঠলে তাহবে তাদের এই স্বাভাবিক দাবির প্রতিবন্ধক। অতএব যখন, যেখানে এবং যেভাবেই ইচ্ছা ও সম্ভব হবে, তখন সেখানেই সেভাবেই তার পরিপুরণের অধিকার থাকতে হবে।

বস্তুত বৈরাগ্যবাদ হচ্ছে যৌন পরিতৃপ্তি ও তার ধ্বংসকারিতার বিরুদ্ধে একটা পলায়নী মানসিকতা। আর অবাধ যৌন সম্পর্ক হচ্ছে মানবতার সঙ্কল্প ও সাহসিকতার পরাজয় এবং দুষ্প্রবৃত্তির মুকাবিলায় সুপ্রবৃত্তির চূড়ান্ত নৈরাশ্যের ঘোষণা। প্রথমটি স্বভাবসিদ্ধ ভাবধারার একদিকের সীমা-লংঘন। আর দ্বিতীয়টি সেই স্বভাবসিদ্ধ ভাবধারার আর এক সীমান্ত অতিক্রমন। এই দুটিই স্বভাব ও প্রকৃতির ভারসাম্যপূর্ণ প্রয়োগের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। প্রথম ভাবধারাটি মা ও বোন প্রভৃতি অতি আপনজনের সংস্পর্শও পরিহার্য করে তোলে। আর দ্বিতীয় ভাবধারাটি কাউকেই নিষ্কৃতি দিতে প্রস্তুত নয়। এটি চায় সর্বপ্রকার লালসা ও ভোগ-উপভোগের অবাধ অধিকার। এ মত অনুযায়ী যে কোন নারী-পুরুষ যেখানে এবং যখনই ইচ্ছা হবে, যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে পারবে। তাতে

কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা ও ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবাঞ্ছনীয়। দুনিয়ায় বেশ্যা প্রথা চালু হওয়ার মূলে এই ভাবধারাই কাজ করছে। এ জন্যে বহু সমাজে বেশ্যাবৃত্তিকে বিশেষভাবে উৎসাহদান করা হয়েছে, যেন পূর্ণ স্বাধীনতা ও নির্ভীকতা সহকারে অবাধে যৌন লালসা মেটানো সম্ভব হয়।

বস্তুত এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা ও অবাধ যৌন স্বাদ-আস্বাদনের প্রাবল্য মানবেতিহাসের প্রায় প্রতিটি অধ্যায়ে লক্ষ্য করা গেছে। বিভিন্ন সময়ে তাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে। কখনও এই ব্যবস্থাকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজন বলে প্রচার করা হয়েছে, আবার কখনও এটাকেই প্রকৃতির দাবি বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করা হয়েছে এবং কোথাও তাকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এর পিছনে মানুষের যৌন লালসার অবাধ নিবৃত্তি স্পৃহাই যে প্রধানত কাজ করেছে, তা অবশ্যই স্বীকার্য।

ইসলামের আগমনের পূর্বে সমগ্র আরব দেশে প্রায় এই ভাবধারারই ব্যাপক প্রভাব ও প্রসার ছিল। তখন সাধারণত চারটি পন্থায় যৌন-বাসনা চরিতার্থ করা হত। প্রথম, যথারীতি বিবাহ ব্যবস্থা। বিয়ে করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি কোন মেয়েকে বিয়ে করতে চাইলে, প্রথমতঃ তার অভিভাবকদের নিকট প্রস্তাব পেশ করত। এই প্রস্তাব গৃহীত হলে নিয়মিত 'মহরানা' দিয়ে বিয়ের কাজ সমাধা করে নেয়া হত। দ্বিতীয়, প্রখ্যাত ও অভিজাত বংশীয় কোন ব্যক্তির ঔরসজাত সন্তান লাভ করার উদ্দেশ্যে স্বামী তার স্ত্রীকে সেই ব্যক্তির নিকট রাত্রি যাপনের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিত এবং যতদিন গর্ভ লক্ষণ প্রকাশ না পেত, ততদিন সে নিজে স্ত্রী মিলন থেকে বিরত থাকত। তৃতীয় পন্থা এই ছিল যে, দশজনের কমসংখ্যক পুরুষ একজন রমনীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করত। এর ফলে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করলে স্ত্রীলোকটি নিজে সেই সন্তানের পিতা নির্দিষ্ট করে দিত। তখন এই স্ত্রীলোকটিও তারই হয়ে যেত। আর চতুর্থ পন্থা এই ছিল যে, আরব দেশে রীতিমত বেশ্যারা দেহ ব্যবসা চালাত। তারা নিজেদের ঘরের দরজায় ঝাণ্ডা উঁচিয়ে রাখত। তাদের নিকট যাওয়ার ও যৌন সম্পর্ক স্থাপন করার অবাধ অনুমতি ছিল সকলের জন্যে। এর ফলে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করত, গণকের সাহায্যে সেই সন্তানের পিতাকে সনাক্ত করে নেয়া হত। তাকে এই সন্তানের পিতৃত্ব অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হত।

তখন এই উপমহাদেশে নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্ক স্থাপনের দু-একটি নয়, আটটি পদ্ধতি চালু ছিল। আর বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, এই আটটি পদ্ধতিই সমাজ কর্তৃক বৈধ ও পবিত্ররূপে স্বীকৃত ছিল। বন্ধ্যা নারীরা সন্তান লাভের

উদ্দেশ্যে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে পূজারীদের সাথে রাত্রি যাপন করত। আর তা সমাজের নিকট কিছুমাত্র দোষণীয় ছিল না। মদীনায় জনৈক ইয়াহুদী রাজা একটা অদ্ভুত আইন জারী করে রেখেছিল। সে আইন বলে যে মেয়ের বিয়ে সম্পন্ন হত, তাকে স্বামীর সাথে মিলিত হওয়ার পূর্বে সেই ইয়াহুদী রাজার সাথে অন্ততঃ একটি রাত্র যাপন করতে হত। অন্যথায় তাকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হতে হত।

বস্তুতঃ নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্ক স্থাপনের নিয়ম ও পদ্ধতি সারা দুনিয়ায় কোন দিনই অভিন্ন ছিল না। যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল প্রায় সব যুগে, মানব সভ্যতার প্রায় প্রতিটি স্তরে ও পর্যায়ে এবং প্রতিটি সমাজে ও স্থানে। কিন্তু সে সঙ্গে একথাও সত্য যে, তাকে কোন দিনই স্বাভাবিক ও বাঞ্ছনীয় বলে মনে করা হয়নি। শত-সহস্র রকমের চরিত্রহীন কর্মকান্ড সত্ত্বেও চারিত্রিক পবিত্রতা ও তাকওয়া-পরহেজগারীই মানবতার উন্নতমানের নৈতিক আদর্শরূপে সর্বকালেই স্বীকৃত ছিল। জীব-জন্তুর ন্যায় যথেচ্ছ যৌন লালসা চরিতার্থ করার অবাধ সুযোগ-সুবিধা ও তার সপক্ষে বৈজ্ঞানিক যুক্তি বিশ্লেষণ নিতান্ত একালের একটা বিশেষ বিশেষত্ব এবং একটা বিশেষ অবদান। কেননা একালে ধরে নেয়া হয়েছে যে, 'মানুষ বিশেষ কোন উদ্দেশ্যমূলক সৃষ্টি নয়', সে নিতান্তই জীব-জন্তুর বংশধর ও জীব-জন্তু ছাড়া আর কিছু নয়। এটা উনবিংশ শতকেরই একটা বিশেষ দার্শনিক চিন্তা মাত্র। জীব-জন্তু তার ইচ্ছা-বাসনা পূরণে কোন্ পন্থা অবলম্বন করেছে, এ বিষয়ে যেমন প্রশ্ন তোলা যায় না, তেমনি মানুষ সম্পর্কেও এই ধরনের প্রশ্ন নিতান্তই অবান্তর। কিন্তু মানুষ নিজেকে জন্তু বলে মেনে নিতে কোনদিনই রাজী হতে পারে না। মানুষকে একালে যে ভুল বোঝানো হয়েছে, সে ভ্রান্তির জাল এক্ষণে বহুলাংশে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছে। ফলে মানুষের মধ্যে সৃষ্ট চারিত্রিক পাশবিকতার ধারনা একালেই ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে। একালের স্বজ্ঞাসম্পন্ন ও সচেতন-বিবেকবান মানুষ এই দর্শনের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। কিন্তু মানুষকে পশু বানাবার ও পশু চরিত্রে ভূষিত করার ষড়যন্ত্রে যেসব প্রক্রিয়া উদ্ভাবন ও সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা এখনও বিশ্ব-মানবতাকে অক্টোপাশের মত আঁক্‌ড়ে ধরে আছে। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, নাচ-গানের আসর, বিচিত্রানুষ্ঠান, থিয়েটার ও সিনেমা এবং বেশ্যা প্রথা মানুষকে চরিত্রহীন পশু বানাবার উদ্দেশ্যে প্রতিনিয়ত কাজ করছে। একালের রেডিও ও টেলিভিশনের সামগ্রিক ভূমিকাও ভিন্নতর কিছু নয়। একালের সাহিত্য–বিশেষ করে কবিতা, উপন্যাস ও নাটক এ একই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত রয়েছে। দেশব্যাপী যৌন অপরাধ, বলাৎকার, নারী হরণ, নারী লাভের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হত্যাকাণ্ড, যৌনরোগ এবং মারামারি, কাটাকাটি ইত্যাদির বড়

কারণই হল এসব উপায়-উপকরণ। এসবকে মানবতার কল্যাণে নিয়োজিত ও সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করা না হলে এমন একটা সময় উপস্থিত হওয়া একান্তই অবধারিত, যখন সমগ্র দেশ গুণ্ডা-বদমাইশ, চোর-ডাকাত, লুণ্ঠনকারী, ছিনতাইকারী, ব্যভিচারী ও নারী হরণকারীদের লীলাভূমিতে পরিণত হবে। ইতিমধ্যেই পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। এখনতো ছিনতাইকারীরাই আমাদের যুবসমাজের নিকট জাতীয় 'হীরো' রূপে সম্মানার্হ। নারী হরণও একালে বীর জনোচিত কর্ম বলে গৃহীত। যুবক বয়সের ছেলে-মেয়েরা বাপ-মাকে না জানিয়েই পরস্পরকে নিয়ে নিরুদ্দেশ হয় অবলীলাক্রমে। সমাজের নৈতিক অধঃপতন বর্তমানে কোন পর্যয়ে উপনীত হয়েছে এ থেকেই তা খানিকটা অনুমান করা চলে।

অশ্লীল বই পত্রের ব্যাপক প্রসার ঘটছে এখনকার সাহিত্যের বাজারে। আবহমানকাল ধরে লালিত নৈতিক মূল্যবোধকে বিনাশ করে চলছে এসব নোংরা বইপত্র। মাদক দ্রব্যের ব্যবহার বর্তমানে কোন বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। নারী-পুরুষ ও শিক্ষিত-অশিক্ষিতদের মধ্যে এদিক দিয়ে কোনই পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না।

প্রতিক্রিয়া

বস্তুতঃ যৌন আকাঙক্ষা মানব জীবনে সর্বাধিক আকর্ষণীয়, মোহময় ও আবেগপূর্ণ এক প্রবৃত্তি। মানুষকে মাতাল, দিশেহারা—এমনকি কাণ্ডজ্ঞানশূন্যও করে দেয় তা। এই দুর্দমনীয় প্রবৃত্তি থেকে মানুষকে বিরত রাখতে পারে একমাত্র পবিত্রতা ও সতীত্ব রক্ষার ধারণা। কিন্তু বর্তমান কালে এই ধারণাকে 'সেকেলে' ও 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলে মূল্যহীন ও গুরুত্বশূন্য করে দেয়া হয়েছে। সর্বশেষ প্রতিবন্ধক ছিল অবৈধ গর্ভ সঞ্চারের ভয়। কিন্তু বর্তমানে গর্ভ-নিরোধক উপকরণ এবং 'ভেসেক্টমী' ও 'লাইগেশন' ব্যবস্থা এই ভয়কে সম্পূর্ণরূপে 'অমূলক' ও 'ভিত্তিহীন' বানিয়ে দিয়েছে। ফলে এখন মানুষ ঠিক জীব-জন্তুর মতই নির্ভিকভাবে 'পাশবিক জীবন' যাপনের 'সৌভাগ্য' অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

এভাবে আধুনিক সমাজ মানুষের নৈতিক চেতনাকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করে দিয়েছে। নারী ও পুরুষের দায়িত্বজ্ঞানকেও করেছে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। সত্যিকার অর্থে আজকের মানুষ একেবারে নিঃস্ব, সর্বহারা। মানব সভ্যতার স্তম্ভসমূহ বিধ্বস্ত ও বিদীর্ণ হয়ে গেছে। মানুষ যেন নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলতে প্রস্তুত নয়। বিশেষ করে যৌন ব্যাপারে কোন রকমের নিয়ন্ত্রণ বা নিয়ম-নীতি পালনের বাধ্য-বাধকতাকেও সে বরদাশ্‌ত করতে রাযী নয়।

এ ধরনের লালসা-পঙ্কিল মন-মানসিকতার লোকেরা সর্বক্ষেত্রে নিতান্ত স্বার্থপর হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকে। তারা নিজেদের যৌন প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্যে যে অসহায় ও দুর্বল নারীকে যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে, তার কঠিন বিপদের দিনেও তার প্রতি একবিন্দু সহানুভূতি ও সহৃদয়তা পোষণ করে না, বরং নিজ বাসনা পরিপূরণের পরই তারা পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে। তারা না স্বীকৃত হয় কোন ধর্ষিতা নারীর স্বামীত্ব গ্রহণ করতে, না প্রস্তুত হয় সেই নারীর গর্ভে সাময়িক দুর্বলতার সুযোগে সঞ্চারিত সন্তানের পিতৃত্বের দায়িত্ব নিজের মাথায় তুলে নিতে।

এহেন মানসিকতার দরুণই একালে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে চরম উচ্ছৃঙ্খলতা ও চরিত্রহীনতার প্রাবল্য দিয়েছে। অথচ অতীতকাল থেকে নারী-পুরুষ দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার পারস্পরিক প্রেম-ভালবাসার দৃঢ় বন্ধনে চিরদিন একত্র জীবন যাপনের শপথ গ্রহণের মাধ্যমেই যৌন আস্বাদনের পথ উন্মুক্ত হয়ে আসছে। একজন অপরজনের সুখ-দুঃখের চির সহচর হয়ে থাকার অটুট প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতেই ঘটেছে তাদের যৌন মিলন। কিন্তু এক্ষণে এসব কথা বাসি ফুলের মতই গন্ধহীন–পায়ের তলায় মাড়িয়ে দেয়া পথের ধুলি মাত্র। যৌন স্বাদ-আস্বাদন এক্ষণে একটা ক্ষণিক প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেয়ার মত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিছক পাশববৃত্তি চরিতার্থ করাই এর লক্ষ্য। অতএব তার পন্থা ও পদ্ধতি কে কিভাবে গ্রহণ করল, সে প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর। আর সেজন্যে একটি নারীকে যে কেবলমাত্র একজন পুরুষের জন্যেই চিরতরে নির্দিষ্ট ও 'রিজার্ভ' হয়ে থাকতে হবে এবং পুরুষকেও বিশেষ একজন বা দু'-তিন জন স্ত্রীর মধ্যেই নিজেকে সীমিত করে রাখতে হবে, এমন কোন কথাই হতে পারে না।

এরূপ মানসিকতার ফল সমাজ জীবনে অত্যন্ত মর্মান্তিক হয়ে দেখা দিয়েছে। এ কারণে নারী-পুরুষের যৌন জীবনে কোন স্থিতি বা দৃঢ়তা গড়ে উঠতে পারে নি। অথচ এই সম্পর্কের ব্যাপারে দৃঢ়তা স্থিতিশীলতা ও ঐকান্তিকতা ছিল নরনারীর আদিম ও শাশ্বত ধারণা। পারস্পরিক যৌন সম্পর্ক স্থাপনে সম্মত হওয়ার অর্থই ছিল–তারা চিরন্তন দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেল। অতঃপর পারস্পরিক প্রেম-ভালবাসা, সম্প্রীতি ও ঐকান্তিকতার পরিবেশে চিরকাল তারা একজন অপর জনের হয়ে থাকবে। তারা হবে পরস্পরের প্রতি গভীর সহানুভূতিসম্পন্ন। একজন অপর জনকে কস্মিনকালেও ত্যাগ করে চলে যাবে না। একজনের বিপদে অপরজন বিপন্ন বোধ করবে। একজনের সুখে অপরজন অকৃত্রিমভাবে উৎফুল্ল হয়ে উঠবে-এই ছিল তাদের পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি। এক কথায়, তারা শুধু কাম-প্রবৃত্তির চরিতার্থতাই লিপ্ত হবে না, তারা হবে অচ্ছেদ্য

বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ। সে কালে নারী-পুরুষের যৌন জীবন কেবলমাত্র এভাবেই সম্ভব বলে মনে করা হত। কিন্তু নব্য চিন্তায় এ ধারণা কর্পুরের মত উবে গেছে। অতপর যৌন সম্পর্ক সাময়িক কামনা চরিতার্থতায় পরিণত হল। আর শুধু কামনা-প্রবৃত্তির চরিতার্থতাই যখন একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল, তখন চিরন্তন বন্ধন হল নিতান্তই অবহেলা ও তাচ্ছিল্যের ব্যাপার। অতএব, একজন অপরজনকে চিরদিনের তরে কেন সহ্য করবে!

কালক্রমে বিবাহ বন্ধন এতই হাস্যস্পদ হল যে, অধিক ধুমপানের কারণে স্ত্রীকে ত্যাগ করা অনিবার্য হয়ে দেখা দিল। মদ্যপায়ী স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রী আদালতে বিচ্ছেদ মামলা দায়ের করল। প্রতিরাত্রে বিলম্বে ঘরে ফেরার অপরাধে স্ত্রী স্বামীকে অভিযুক্ত করল ও বিচ্ছেদের দাবি জানাল। এমন কি, স্বামী সিগ্রেটের ধুয়া মুখের ওপর ছাড়ার অপরাধে স্ত্রী তার কাছে তালাক চাইল। স্বামী জামা-জুতা পরিধান করেনা বলে স্ত্রী তার হয়ে থাকতেও অস্বীকৃতি জানাল। স্বামী স্ত্রীর বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ তুলল যে, সে ঘরে ফিরার পূর্বেই স্ত্রী তার জন্যে অপেক্ষা না করে রাতের খাবার একাকী খেয়ে নেয়। শতবার সাবধান করা সত্ত্বেও স্ত্রী তার এই কাজ থেকে বিরত হয়নি। অতএব তাকে আর স্ত্রী হিসেবে রাখা সম্ভব নয়।

বিবাহ বন্ধন শুধু যে উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্যের শিকার হয়েছে কিংবা মূল্যহীন হয়ে পড়েছে, তা-ই নয়, যৌন বৈচিত্রের প্রবৃত্তি নৈতিকতা ও মানবিকতার সমস্ত মূল্যমান চুরমার করে ফেলেছে। মানুষকে তা নিতান্ত জীব-জন্তুর পর্যায়ে নামিয়ে দিয়েছে। স্বামীকে একঘেয়ে লাগছে বলে স্ত্রী তাকে হত্যা করছে এবং ঘরের যুবক চাকর, বয়ফ্রেন্ড বা স্বামীর যুবক বন্ধুর সাথে পরম আনন্দে দিন কাটাতে শুরু করছে। আবার বহু স্বামী তাদের একান্ত নিবেদিত স্ত্রীকে হত্যা করছে এই কারণে যে, তার উপস্থিতিতে সে অন্য যুবতীদের সাথে রাত্রি যাপন করার সুযোগ পাচ্ছেনা।

বস্তুত যে সমাজে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও প্রেম-প্রণয় চর্চ্চা অতীব সাধারণ ব্যাপার, সেখানে কোন পুরুষের পক্ষে বহুসংখ্যক নারীর প্রেমিক হওয়া এবং একজন সুন্দরী যুবতীর পক্ষে বহুসংখ্যক পুরুষের মক্ষীরাণীতে পরিণত হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র ব্যাপার নয়। আর তার ফলে প্রেমিক বা প্রেমিকাকে জয় করবার জন্যে লোকদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হওয়া এবং সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। এরই অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে শক্তির অবক্ষয়, মানব বংশের প্রতি ঘৃণা ও উপেক্ষা, ধৈর্য ও সহনশীলতার অভাব, হৃদয়াবেগের প্রচণ্ডতা, ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিবর্তে

স্বার্থপরতা ও শোষন-লুণ্ঠনের প্রবণতা, সংহতি, সহৃদয়তা ও সম্প্রীতির পরিসমাপ্তি এবং মতবিরোধ, দ্বন্দ্ব-কলহ ও রক্তারক্তি। যৌনবাদের এই হচ্ছে স্বাভাবিক পরিণতি। বর্তমান পাশ্চাত্য সমাজে ও পাশ্চাত্য প্রভাবিত এদেশীয় সমাজে আজ আমরা এই কলঙ্কিত অবস্থাই প্রত্যক্ষ করছি। আজ এ প্রশ্ন তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে যে, এই অবস্থা কি ব্যক্তি, বংশ, পরিবার ও জাতির চরম বিপর্যয়ের লক্ষণ নয়? এরূপ সমাজ ও জাতির তো ধ্বংস হয়ে অস্তিত্বের পটভূমি থেকে চিরতরে বিলীন হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তবু আমরা দেখতে পাচ্ছি, এধরণের জাতিই বিশ্ব-নেতৃত্বের উচ্চতর আসনে আসীন হয়ে মানব জাতিকে পথ প্রদর্শন করছে! চিন্তা-গবেষণা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আবিষ্কার-উদ্ভাবনীর ক্ষেত্রে এ জাতি আজও অগ্রসর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এটা কি করে সম্ভব হচ্ছে?

আসল ব্যাপার হল, বর্তমানে যারা বিশ্ব-নেতৃত্বের আসনে সমাসীন, তারা শুরুতে এরূপ অধঃপতিত ছিলনা। যে সময় তাদের ওপর উন্নতি ও অগ্রগতি লাভের আবেগ কর্ম্মমুখর হয়েছিল, তখন যৌন উচ্ছৃংখলতার প্রবণতা তাদের উপর এতটা আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি। তারা নিজদের শক্তি-সামর্থ্য ও প্রতিভাকে গঠনমূলক কাজে লাগাবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছিল। কামনা-বাসনা-লালসার চরিতার্থতা তখন তাদের নিকট মুখ্য ছিলনা। তাই বলে তারা সর্বপ্রকার নৈতিক ত্রুটি-বিচ্যুতিমুক্ত ছিল, এমন কথাও নয়। তবে ব্যক্তি ও জাতি গঠনমূলক প্রবণতা বিশ্বের অপরাপর সমাজ ও জাতির তুলনায় তাদের অধিক প্রবল ছিল, এতে সন্দেহ নেই। এখনও এই প্রবণতা নিঃশেষ হয়ে গেছে বলে মন্তব্য করাও যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না। তবে পতনের লক্ষ্য যে সর্বাত্মকভাবে দেখা দিয়েছে, তা অনস্বীকার্য।

তাই এটা দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যায় যে, বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা অতি দ্রুত গতিতে চূড়ান্ত পতন ও সর্বাত্মক বিপর্যয়ের দিকে ছুটে চলছে। এর অভ্যন্তরে ধ্বংসের যে জীবাণু প্রবিষ্ট হয়েছে, তা একে চূড়ান্ত বিনাশের দিকেই নিয়ে যাচ্ছে, এবিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

পূর্বেই বলেছি, যৌন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের প্রশ্নে দুনিয়ার বড় বড় চিন্তাবিদরা নিজেদের চরমভাবে ব্যর্থ ও নিরুপায় প্রমাণ করেছেন। এক্ষেত্রে কোনরূপ ভারসাম্য রক্ষা করাই তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। এক সময় তারা নৈতিক চরিত্র রক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে চরম বৈরাগ্যবাদের পন্থা উদ্ভাবন করেছেন। আবার এক সময়ে যৌন কামনা-বাসনার দাবি রক্ষা করতে গিয়ে মানুষের নৈতিক চরিত্র ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছেন। মানবীয় চিন্তা ও গবেষণার এই চরম ব্যর্থতা অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছে যে, মানবীয় সমস্যাবলীর কোন একটিরও সমাধান নিতান্ত মানবীয় চিন্তা-গবেষণা ও বিবেক-বুদ্ধির দৌলতে হওয়া সম্ভবপর নয়; তা সম্ভব কেবলমাত্র মানব-স্রষ্টা মহান আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত দ্বীন-ইসলামের ভিত্তিতে।

বৈরাগ্যবাদ ও নৈতিক বিপর্যয় এই দুটি প্রান্তিক অবস্থার মধ্যে পুরাপুরি ভারসাম্য রক্ষা করা কেবলমাত্র দ্বীন-ইসলামের পক্ষেই সম্ভব। ইসলাম একদিকে যৌন সমস্যার অতীব স্বভাবসম্মত সমাধান পেশ করেছে, অপরদিকে নৈতিক মূল্যমানকে সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ন রেখেছে। সে কামনা-বাসনা তথা প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে যেমন মানুষকে রক্ষা করেছে, তেমনি এ সবের পূর্ণ পরিতৃপ্তির ব্যবস্থাও সঠিক ভারসাম্য সহকারে উপস্থাপন করেছে। এ পর্যায়ের বিস্তারিত আলোচনাকে আমরা এখানে পাঁচটি ভাগে পেশ করছি।

ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিকোণ

খৃস্ট ধর্মের প্রখ্যাত 'হীরো' সেন্ট্পলের চিন্তাধারা হচ্ছে, অবিবাহিত পুরুষ সবসময় খোদার চিন্তায় আত্মনিমগ্ন থাকে; সে কেবল খোদাকেই সন্তুষ্ট রাখতে সচেষ্ট। পক্ষান্তরে বিবাহিত ব্যক্তি সর্বদা বৈষয়িক চিন্তা-ধান্ধায় ব্যাপৃত থাকে। সে কেবল নিজের স্ত্রী ও পরিবার-পরিজনের চিন্তায়ই মশগুল। বিবাহিতা স্ত্রী ও অবিবাহিতা রমণীর মধ্যেও অনুরূপ পার্থক্য বিদ্যমান। অবিবাহিতা যুবতী সব সময় খোদাকে সন্তুষ্ট রাখতে ব্যস্ত। পক্ষান্তরে বিবাহিতা মহিলা স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখার চিন্তায়ই বিভোর হয়ে থাকে।

কিন্তু এই চিন্তাধারা সম্পূর্ণ ভারসাম্যহীন। ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট রাখার জন্যে দাম্পত্য জীবনের প্রতি অনীহা পোষণের কোনই প্রয়োজন নেই। কেননা দাম্পত্য জীবন মূলতঃই খোদানুগত্যের ব্যাপারে কিছুমাত্র প্রতিবন্ধক নয়।

তা-ই যদি হত, তাহলে মানুষ স্বীয় প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্যে যৌন সম্পর্ক স্থাপনে যেমন বাধ্য হত না, তেমনি কেবলমাত্র এই সম্পর্ক স্থাপনের উপরেই মানব বংশের ধারা রক্ষা নির্ভরশীল হত না। সেক্ষেত্রে এমন সব উপায়ও তাদের করায়ত্ত থাকত, যা অবলম্বন করে মানুষ এসব উদ্দেশ্য লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌কেও সন্তুষ্ট রাখার ব্যবস্থা করতে পারত।

বিশেষতঃ আল্লাহ্‌র যে সব নবী-রাসূল আল্লাহকে সন্তুষ্ট রাখার পথ দেখাবার উদ্দেশ্যে দুনিয়ায় এসেছিলেন, তাঁরা নিজেরাও অবিবাহিত জীবন যাপন করতেন না এবং কাউকে এই জীবন ধারণের উপদেশও দিতেন না। তাঁদের সম্পর্কেই কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّنْ قَبْلِكَ وَ جَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً، (الرعد: ٣٨)

আর আমরা (হে নবী) তোমার পূর্বে অনেক রাসূল পাঠিয়েছি এবং তাদের জন্যে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি বানিয়ে দিয়েছি।

স্বয়ং নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেনঃ বিবাহ নবীগণের সুন্নাত।

বৈরাগ্যবাদকে কুরআন মজীদ আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উপায় বলে মনে করে না। মূলত এ মতটি সম্পূর্ণরূপে মানুষের মনগড়া। কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ

وَرَهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ،

বৈরাগ্যবাদ লোকদের নিজেদের উদ্ভাবিত। আমরা তাদের জন্যে এই বিধান দিই নি।

রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ

لاَ رَهْبَانِيَّةَ فِى الْاِسْلاَمِ،

ইসলামে বৈরাগ্যবাদের কোন স্থান নেই।

হাদীস শরীফে উদ্ধৃত হয়েছেঃ

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ التَّبَتُّلِ،

নবী করীম (স) বিবাহ না করা ও দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে লোকদের নিষেধ করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) অপর একজন অবিবাহিত ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বললেনঃ 'বিয়ে কর। বিয়ে না করাটা খোদাভীতি বা ধার্মিকতার লক্ষণ নয়।'

ভারসাম্যপূর্ণ আদর্শ ইসলামী জীবনের পন্থা ব্যাখ্যা করে নবী করীম (স) বলেছেনঃ

أَمَا وَ اللّٰهِ إِنِّيْ أَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ وَ لٰكِنِّيْ أَصُوْمُ وَ أُفْطِرُ وَ أُصَلِّيْ وَ أَرْقُدُ وَ أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ،

(بخاری)

- আল্লাহ্‌র শপথ, তোমরা আমার নীতিটাই দেখ। আমি তোমাদের তুলনায় অধিক আল্লাহ্‌ভীরু, একথা তোমরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবে। অথচ দেখ, আমি নফল রোযা রাখি, ভঙ্গও করি। আমি রাত্রি জাগরণ করে নফল নামায পড়ি, ঘুমাইও। সেই সঙ্গে বিবাহিত নারীসঙ্গও লাভ করি।

বস্তুতঃ খোদানুগত জীবন যাপনের জন্যে যৌন জীবন পরিহার করার প্রয়োজন যারা মনে করেন, তারা ইসলাম প্রদত্ত খোদানুগত জীবন সম্পর্কে কোন জ্ঞানই রাখে না। প্রকৃতপক্ষে ইসলামী জিন্দেগীটাই খোদানুগত জীবন এবং এ জীবনে বিবাহিত হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিয়ের গুরুত্ব

পারিবারিক দায়িত্ব পালন মানুষের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। দান-খয়রাত করা ইসলামের দৃষ্টিতে খুবই সওয়াবের কাজ। কিন্তু পরিবারবর্গের জন্যে অর্থব্যয় সর্বাধিক সওয়াব পাওয়ার অধিকারী।

বস্তুত আল্লাহ্‌র প্রতি উপেক্ষা যেমন ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ, ঠিক তেমনি ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ হচ্ছে পারিবারিক দায়িত্ব পালনে অনীহা। স্ত্রীর সাথে যৌন সম্পর্ক রক্ষা করাও সুস্থ-সবল মানুষের অতিবড় দায়িত্ব। বিশেষজ্ঞদের ঘোষিত মত হচ্ছেঃ বিবাহিত জীবন অবলম্বন না করে কেবল ইবাদাত-বন্দেগীর কাজে লিপ্ত হওয়া কোনক্রমেই কল্যাণকর ও মঙ্গলময় নয়। নারী জাতির প্রতি ঘৃণা পোষণ ও তাদের সম্পূর্ণ বর্জন করে চলার প্রবণতা মানব সভ্যতার পক্ষে মারাত্মক। এ কারণেই নবী করীম (স) অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ইরশাদ করেছেনঃ

مَنْ قَدَرَ عَلَى النِّكَاحِ فَلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنَّا (دارمی)

যে ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে, সে যদি বিয়ে না করে তাহলে সে আমার পথের অনুসারী নয়–আমার উম্মাতের মধ্যে গণ্য নয়। –দারেমী

নবী করীম (স) যুব সমাজকে সম্বোধন করে ভাষণদান প্রসঙ্গে বলেছেনঃ

হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে যারা যৌন সম্পর্ক রক্ষায় সক্ষম, তারা যেন অবশ্যই বিয়ে করে। কেননা এটা (বিয়েটা) দৃষ্টিকে নত রাখে, যৌন অঙ্গের পবিত্রতা রক্ষা করে। –বুখারী

বিয়ের এই গুরুত্ব বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম অবৈধ পন্থায় যৌন সম্পর্ক স্থাপনকে কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছে। একমাত্র বিয়েই হচ্ছে ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্ক স্থাপনের বৈধ উপায়। এছাড়া আর যত উপায় ও পন্থাই সম্ভব, ইসলামের দৃষ্টিতে তা সম্পূর্ণ হারাম।

কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ

وَ لَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَآءَ سَبِيْلًا ، (بنى اسرائيل : ٤٣)

তোমরা ব্যভিচারের নিকটেও ঘেঁষবে না। কেননা তা অত্যন্ত নির্লজ্জতার কাজ এবং অতীব খারাপ পথ।

পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ্‌র নেক বান্দাহদের পরিচয় দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ

وَ الَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَ لَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ
اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ لَا يَزْنُوْنَ* (الفرقان: ٦٨)

যারা এক আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাউকে শরীক করে না, আল্লাহ্‌র হারাম করে দেয়া প্রাণী হত্যা করে না-তবে আইন-সম্মত হত্যার কথা ভিন্ন–আর যারা ব্যভিচার করে না–তারাই আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাহ্‌।

এ পর্যায়ে ইসলামী বিধানের প্রকৃতি হচ্ছে, কারুর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনই মূলত হারাম। তবে শরীয়াত এই জন্যে যে নিয়মকে বৈধ ঘোষণা করেছে, শুধু সেই পন্থায়ই তা বৈধ গণ্য হবে; তার বাইরে কোন বৈধ পথই থাকতে পারে না। –যাদুল মায়াদ

ফিকাহর প্রামাণ্য গ্রন্থে লেখা হয়েছেঃ পুরুষদের বাধ্য করা হয়েছে কেবল সে-সব স্ত্রী লোকদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে, যাদেরকে তাদের জন্যে

হালাল করে দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে স্ত্রী লোকদেরও যৌন আবেদন পূরণের জন্যে কেবলমাত্র তাদের স্বামীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য করা হয়েছে।

ব্যভিচার অবৈধ ঘোষণা করে তার কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদে যে তত্ত্ব পরিবেশন করা হয়েছে, তা হচ্ছেঃ নিয়ম-শৃঙ্খলা বিবর্জিত স্বাধীন ও অবাধ যৌন সম্পর্ক চালিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমার মধ্যে থেকে স্বীয় যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করাই হচ্ছে আল্লাহ্র সে-সব নেক বান্দাহ্র নীতি ও চরিত্র, যাদের উপর আল্লাহ্র রহ্মত সব সময়ই বর্ষিত হতে থাকে। বস্তুতঃ এসব লোকই মানবতার কিশ্তীকে আবেগ-উচ্ছাস ও কামনা-লালসার উত্তাল তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের বুক থেকে উদ্ধার করে সুস্থ জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধির বেলাভূমে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁরাই মানবতার সঠিক ও নির্ভুল মূল্যায়ন করতে পেরেছেন। মানবতার ব্যর্থতার কারণ তাঁরাই বুঝতে পেরেছেন; সাফল্যের পথ তাঁরাই দেখাতে পেরেছেন। তাঁদের একান্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফলেই মানুষের মধ্যে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিকে সতেজ ও সক্রিয় করে তোলা সম্ভব হয়েছে। তাঁদের শিক্ষণ-প্রশিক্ষণের ফলে দুনিয়ার আবেগ-বিহ্বল লোকগুলোকে সেরা বুদ্ধিমানে রূপান্তর করা সম্ভব হয়েছে। তাঁদের চরিত্র ও নৈতিকতা ছিল সম্পূর্ণ ও সর্বতোভাবে কলঙ্কমুক্ত। তাঁদের উন্নত ও পবিত্র নৈতিকতার কোন তুলনাই জগতে পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয়তঃ যে জাতিই যৌন উচ্ছৃঙ্খলতায় নিমজ্জিত হয়েছে, সে জাতিই মর্মান্তিকভাবে ব্যর্থ হয়েছে। সে জাতি নিতান্ত অন্ধের মতই ধ্বংসের মহা গহ্বরে তলিয়ে গেছে। তাদের হাত ধরে তুলবারও কেউ নেই কোথাও। তারা পাশব বৃত্তির অন্ধ অনুসারী। তাদের চোখ থাকতেও নেই সে চোখে এতটুকু দৃষ্টিশক্তি। তাই তাদের পতন ঘটেছে অনিবার্যভাবে। এটাই ইতিহাসের সিদ্ধান্ত আর ইতিহাসের সিদ্ধান্তের কখনও ব্যতিক্রম দেখা দেয় না।

তৃতীয়তঃ এই বিধানের মাধ্যমে কুরআন চায়, মানুষ হৃদয়াবেগের অন্ধ দাসত্ব পরিহার করে একান্তভাবে আল্লাহ্র অনুগত হয়ে থাকুক, তাহলেই তাদের পক্ষে আল্লাহ্র রহ্মত লাভ করা সম্ভব হবে। তারা এমন জীবন লাভ করতে পারবে, যা পরম শান্তি, স্বস্তি ও নিরুদ্বেগে ভরপুর। কিন্তু প্রবৃত্তির দাসানুদাসেরা চায়, সারা দুনিয়ার মানুষ তাদেরই মত লালসার দাস হয়ে থাকুক।

চতুর্থ এই যে, যৌন সম্পর্ক স্থাপনকে আল্লাহ্-তা'আলা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে দেননি। তিনি শুধু এর উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছেন। তাই বৈধ পন্থায়

যৌন তৃপ্তির পথও উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। এসব পথও যদি রুদ্ধ থাকত, তাহলে লালসার প্রবল সয়লাব-স্রোতে মনুষ্যত্বের সমস্ত মহান মূল্যবোধ একেবারে ভেসে যেত। কেননা মানুষ স্বভাবতঃই দুর্বল প্রকৃতির। হৃদয়াবেগ ও যৌন প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ দমন করে রাখা তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাই মানুষের এই স্বাভাবিক দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিষেধাজ্ঞার মধ্যে বৈধতার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

পঞ্চম ও সর্বশেষ তত্ত্ব হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করা, তাকওয়া পরহেজগারী অবলম্বন করা এবং পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতার নীতি অনুসরণ করা মানব প্রকৃতির সাথে সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। এ হচ্ছে মানব প্রকৃতির অভ্যন্তর থেকে উত্থিত এক স্বতঃস্ফূর্ত তাগিদ, তাই সতীত্ব, নৈতিকতা ও পবিত্রতার ধারণার সাথে মানব প্রকৃতির কোন বৈরিতা বা দ্বন্দ্ব নেই; বরং তা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে প্রকৃতির তাগিদকে সাদর সম্বর্ধনা জানায়। তদনুযায়ী আমল করার ফলে এমন এক আলোকবর্তিকা তার করায়ত্ত হয়, যার সাহায্যে মানুষের চরম সাফল্যের পথে এগিয়ে চলা সম্ভব।

বস্তুত ইসলাম যৌন সম্পর্ক পর্যায়ে একটা-সুস্পষ্ট ধারণা উপস্থাপন করেছে। সেই ধারণার ভিত্তিতে ইসলাম ব্যক্তির প্রশিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-সংস্কারের কাজও সুসম্পন্ন করে। কেননা ইসলাম উপস্থাপিত সে ধারণার সাফল্য এ দু'টি কাজের উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল।

ব্যক্তির প্রশিক্ষণ

ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সমাজ গঠিত। আর সামাজিক আদর্শের বাস্তবায়ন ও সাফল্য ব্যক্তিগত পর্যায়ে তার অনুসরণের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। জনগণ যদি সামাজিক আদর্শকে নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে মেনে চলতে প্রস্তুত না হয়, তাহলে তার বাস্তবায়ন কখনই সম্ভবপর হতে পারে না। এজন্যে জনগণকে ঐকান্তিকতা সহকারে প্রস্তুত হতে হবে নিজেদের জীবনে পরিবর্তন আনতে। এই কারণে প্রতিটি সমাজই তার নিজ আদর্শ অনুযায়ী ব্যক্তিদের গঠন করার জন্যে সদা চেষ্টা চালাতে থাকে। ইসলামী জীবনাদর্শও অন্যান্য সব কাজের চাইতে অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে ব্যক্তিদের জীবনকে স্ব-আদর্শে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করার উপর; তবে এদিক দিয়েও দুনিয়ার অন্যান্য মতাদর্শের উপর ইসলামের বিশেষত্ব রয়েছে। ইসলাম মানবতার প্রতি কোনরূপ নৈরাশ্য পোষণ করে না; বরং তার শোধন প্রয়াস চলে মানবতার প্রতি পরম আশাবাদের ভিত্তিতে। মানুষ সম্পর্কে ইসলামের ধারণা অতীব উচ্চ ও মহান। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ জন্মগতভাবে অপরাধী ও পাপপ্রবণ নয়। তার প্রকৃতি মালাকুতী মহিমায় সমৃদ্ধ ও সুষমামণ্ডিত। মূলত ভুল চিন্তা-বিশ্বাস ও বিপর্যয়কারী শিক্ষা-প্রশিক্ষণই মানবতাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু বর্তমান বিশ্ব-বিজয়ী সভ্যতা মানুষ সম্পর্কে অত্যন্ত নৈরাশ্যবাদী। তার দৃষ্টিতে মানব প্রকৃতিতেই পাপ ও দুষ্কৃতি নিহিত। যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থতার ব্যাপারেও বর্তমান বিশ্ব-সভ্যতার অবাধ ও উন্মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি সর্বজনবিদিত। তার ধারণা, মানুষ যেমন মল-মূত্র ত্যাগ করার জন্যে প্রকৃতির ডাকে তাৎক্ষণিক সাড়া দিতে বাধ্য, যৌন তাড়না চরিতার্থ করাও তার জন্যে তেমনি অনিবার্য। অতএব এক্ষেত্রে কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ বা বিধি-নিষেধ আরোপ করতে বর্তমান সভ্যতা প্রস্তুত নয়।

পক্ষান্তরে ইসলাম ঘোষণা করেছে, নিয়ন্ত্রণমুক্ত যৌন চর্চা ও কামনা-লালসা চরিতার্থ করা ব্যভিচার ছাড়া কিছুই নয় এবং ব্যভিচার একটা মহা পাপ বিশেষ। সুস্থ ও স্বাভাবিক মানব প্রকৃতির সাথে ব্যভিচারের কোন সঙ্গতি বা সাযুজ্য নেই। পূণ্য ও পবিত্রতাই মানব প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পাপকার্যে মানবতার কোন মহত্ব নেই। শুভ, পুণ্য ও ন্যায় আচরণেই মানুষের মহিমা নিহিত। অকল্যাণে কারুরই একবিন্দু মঙ্গল নেই। কল্যাণেই সার্বিক মঙ্গল নিহিত। তা যদি না হত,

তাহলে মানুষই কেন অন্যায় কাজ করলে মানসিক দংশনে ছটফট করতে থাকে? পাপ কাজে তার নিজের প্রকৃতিই কেন প্রতিবাদী হয়ে ওঠে? তার কারণ হল, মানব প্রকৃতি পাপপ্রবণ নয়। তার আত্মমর্যাদার মহিমা সর্বপ্রকার ন্যায়, পবিত্র ও মহত্তর আচরণের সাথে সংশ্লিষ্ট। উত্তম, পবিত্র ও নিষ্কলুষ কার্যাবলীতেই মানুষের অহম্‌ প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ লাভ করতে পারে। এই কারণে নিতান্ত অসাধু ব্যক্তিকেও জনগণের সামনে সম্পূর্ণ সাধুতার বেশ ধরে আসতে হয়। কেননা মানুষ অসাধুতা পছন্দ করে না–বরদাশত করতে প্রস্তুত নয়, এটা সর্বজনবিদিত।

কুরআন মজীদ মানুষের মধ্যে এই চেতনাটিকেই তীব্রভাবে জাগ্রত করতে চায়। সে ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বারবার বলছে, আত্মপ্রতারণায় আর কতকাল নিমজ্জিত থাকবে? তোমাদের মান-সম্মান-সম্ভ্রম যদি বাস্তবিকই রক্ষা করতে চাও, তা হলে এসব মহৎ গুণাবলী অর্জনের জন্যে জীবনকে উৎসর্গ করে দাও।

আগের কালের লোকেরা অন্যায় ও পাপ কার্যের সপক্ষে যুক্তি হিসেবে বলত, আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষদের এইসব কাজই করতে দেখেছি। আর আল্লাহ্‌ই যখন আমাদের দ্বারা এসব করাচ্ছেন, তখন কার কি বলবার থাকতে পারে? আজকের যুগের পাপীষ্ঠরাও নির্লজ্জভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুক্তি প্রদর্শন করছে। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল, আল্লাহ্‌ নিজে কারুর দ্বারা কোন পাপ করান না, বাপ-দাদারা পাপ করে থাকলেও পাপ কার্যের যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয় না। আর নির্ভুল জ্ঞান-বিজ্ঞান যে কখনই কোন পাপ কাজের অনুমতি দেয় না, তা পাপীষ্ঠরা বুঝতেই চায় না। বুঝলেও তা মুখে কখনও স্বীকার করবে না।

মানুষ স্বভাবতই কল্যাণপ্রবণ। এই কারণে মানুষ ভুলক্রমে পাপে লিপ্ত হয়ে পড়লেও চিরকাল তার মধ্যে লিপ্ত থাকতে পারে না। একদিন-না-একদিন তার হৃদয়-মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। মানুষের এই সুস্থ মন-মানসিকতাই তার সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি। এই মনই মানুষকে অন্যায় কাজের দরুণ তিরস্কার করে এবং শুভ কাজের জন্যে সুখানুভূতি জাগায়। মনের এই ডাকই সর্বপ্রকার অন্যায় কাজের পথে প্রধান অন্তরায়। তবে মিথ্যা প্রচারণা ও প্ররোচনায় মানব মন সাময়িকভাবে দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। এ কারণেই ইসলাম মানুষের হৃদয়-মনকে মহত্তর আদর্শ শিক্ষার সাহায্যে সব সময় সজাগ, সক্রিয় ও বলিষ্ঠ করে রাখতে সচেষ্ট। জনৈক সাহাবীর এক প্রশ্নের জবাবে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স) ইরশাদ করেছেনঃ

اَلْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَ الْاِثْمُ مَا حَاكَ فِىْ نَفْسِكَ وَ كَرِهْتَ اَنْ يَّطَّلِعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، (ترمذى)

উত্তম চরিত্রই হচ্ছে পুণ্য কাজ। আর যে কাজ তোমার মনে কুণ্ঠা জাগায় এবং লোকেরা তা জানুক তা তুমি পছন্দ কর না, তাই হচ্ছে পাপের কাজ।

–তিরমিযী

বস্তুতঃ পাপ কাজ মানুষকে সব সময় কুণ্ঠিত করে রাখে। তাতে মানুষ নিজেকে বিব্রত বোধ করে। তা সব সময় মানুষের মনে কাঁটা হয়ে বিঁধতে থাকে। পক্ষান্তরে উত্তম চরিত্র মানুষকে কল্যাণময় করে রাখে। মূলতঃ ঈমানই মানুষের মধ্যে এই গুণের সৃষ্টি করে। নবী করীম (স) এ কথা বোঝাবার জন্যেই বলেছেনঃ

اِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَ سَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَاَنْتَ مُؤْمِنٌ (مسند احمد)

তোমার ভাল কাজ যখন তোমাকে সন্তুষ্ট করবে এবং তোমার মন্দ কাজ তোমার খুবই খারাপ লাগবে, তখনই বুঝবে তুমি একজন ঈমানদার লোক। –মুসনাদে আহমদ

মানুষ যখন নিজের সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপারে সচেতন হয়, অনুভূতি তীব্রভাবে জেগে উঠে, তখন মর্যাদাহানিকর কোন কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। লজ্জা তাকে সকল প্রকার পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। এই লজ্জাও মানুষের চরিত্র রক্ষার এক অতন্দ্র প্রহরী। রাসূলে করীম (স)-এর ভাষায় এই লজ্জা ঈমানেরই অঙ্গ। এই অঙ্গটিও যদি লোপ পেয়ে যায়, তখন মানুষ যা ইচ্ছা তা-ই করে বসে। আবহমান কাল থেকে নবী-রাসূলগণ মানুষকে এই শিক্ষাই দিয়ে এসেছেন। এই কারণে নির্লজ্জতা ও নগ্নতা-উলঙ্গতা চিরকালই ঘৃণার্হ বলে বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা এই লজ্জার ধনটি হারিয়ে ফেলেছে। তাই যারা এখনও নির্লজ্জতা গ্রহণ করেনি, তাদেরও চরম নির্লজ্জ বানাবার জন্যে আধুনিক সভ্যতা সর্বপ্রকার আয়োজন করে চলেছে।[১]

পরকালীন জবাবদিহির অনুভূতি

বস্তুত লজ্জা চরিত্রবান মানুষের ভূষণ, তার অলঙ্কার। কিন্তু লজ্জার স্থায়িত্ব ও কার্যকারিতা নির্ভর করে পরকাল-বিশ্বাসের অনুভূতির উপর। কারো মনে যদি এই প্রত্যয় থাকে যে, আজ যদি আমি কোন প্রকার নাফরমানীর কাজ করি,

১। আধুনিক সিনেমা-নাটক, নৃত্য-গীত, বিজ্ঞাপন-চিত্র এবং রেডিও-টিভির বিনোদন অনুষ্ঠান এই নির্লজ্জতারই প্রচার ও প্রসারে সর্বতোভাবে নিবেদিত। তরুণ-তরুণীদের মন থেকে লজ্জাবোধ মুছে ফেলে পাশবিকতা জাগিয়ে তোলাই এর উদ্দেশ্য, তা সুস্পষ্ট ও সন্দেহাতীত। কারণ এর মাধ্যমেই তাদেরকে ঈমানের পথ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়া সম্ভব। তাই এর বিরুদ্ধে গণ-প্রতিরোধ গড়ে তোলাই হচ্ছে সময়ের দাবি। — সম্পাদক

তাহলে কাল কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে আমি আল্লাহ্‌র সামনে কিভাবে দাঁড়াব? কেমন করে তাঁকে মুখ দেখাব? –তাহলে সে কোন পাপ কাজে লিপ্ত হতে পারেনা। পক্ষান্তরে এই দুনিয়াই যদি চূড়ান্ত হয়, তাহলে পাপ-পূণ্য, ন্যায়-অন্যায় ও লজ্জা-শরমের কোন বালাই থাকতে পারে না; কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তো তা নয়। পরকালে আল্লাহ্‌র সামনে যে দাঁড়াতে হবে, তাতে সন্দেহের অবকাশই নেই। তাই লজ্জানুভুতির ভিত্তি হচ্ছে পরকাল বিশ্বাস।

তাই যাদের বাস্তবিকই চক্ষু-লজ্জা বলতে কিছু আছে, তারা হয়ত লোক-লজ্জার কারণে পাপ কাজ এড়িয়ে যায়। কিন্তু এ লজ্জাবোধটা খুবই ঠুনকো ভিত্তির উপর স্থিত। লোকদের মনে যদি এই বিশ্বাস থাকে যে, হাশরের ময়দানে সমস্ত মানুষের কাতারে তাকে এই পাপ কাজের জন্যে অপদস্থ হতে হবে, কেবল তাহলেই তার পক্ষে কোন পাপ কাজের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা সম্ভব নয়। কুরআন মজীদের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতে এই চিত্রই আঁকা হয়েছেঃ

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَ زِيَادَةٌ وَ لَا يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَ لَا ذِلَّةٌ
اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝ وَ الَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَآءُ
سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ كَاَنَّمَآ اُغْشِيَتْ
وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا
خٰلِدُوْنَ ۝ (يونس)

যে-সব লোক এই দুনিয়ায় উত্তম নীতির অনুসরণ করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে উত্তম প্রতিফল। তার চাইতেও বেশী দেয়া হবে তাদের। তাদের মুখমণ্ডল তিমিরাচ্ছন্ন হবে না; তারা কোনরূপ অপদস্থতারও সম্মুখীন হবে না। তারা জান্নাতবাসী হবে এবং সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। পক্ষান্তরে যারা পাপ কাজ করেছে, তাদের প্রতিটি পাপ কার্যের অনুরূপ শাস্তি তারা ভোগ করবে। অপমান-লাঞ্ছনা তাদের মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করে রাখবে। আল্লাহ্‌র আযাব থেকে তাদের কেউই বাঁচাতে পারবে না। তাদের মুখমণ্ডল এতটা মসিলিপ্ত হবে যে, মনে হবে, অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রির একটি অংশ তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তারা হবে দোজখবাসী এবং সেখানে তারা চিরকালই থাকবে। –সূরা ইউনুস

মহান লা-শরীক আল্লাহ্‌র প্রতি ও পরকালে জবাবদিহির প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় ঈমানের ভিত্তি। ব্যক্তির সমস্ত কাজ-কর্ম এই ঈমান ও প্রত্যয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে থাকে। অতঃপর কোনরূপ পাপ ও নাফরমানীর কাজ কল্পনাও করা যায় না। হযরত ইউসুফ (আ)-এর কুরআনে বর্ণিত কাহিনী থেকে একথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। বস্তুতঃ এই ঈমান ও প্রত্যয় যাদের হৃদয়-মনে দৃঢ়মূল হয়ে বসে, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ রূপ-লাবণ্য ও যৌবন-সৌন্দর্যও তাদের বিচলিত করতে পারে না। মিসরের সেরা সুন্দরী-যুবতীরা হযরত ইউসুফ (আ)-কে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিল; কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র ভয়ে ছিলেন কম্পমান। তিনি এই পদস্খলনের পরিবর্তে বৈষয়িক যে কোন কষ্ট স্বীকার করতেও অকাতরে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি কাতর কণ্ঠে আল্লাহ্‌কে ডেকে বলেছিলেনঃ

رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِىْٓ اِلَيْهِ وَ اِلَّا تَصْرِفْ عَنِّىْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَ اَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ۔(يوسف: ٣٣)

হে খোদা! এরা আমাকে যে দিকে ডাকছে, তার চাইতে কারাগারই আমার নিকট প্রিয়তর। হে খোদা! তুমিই যদি ওদের ষড়যন্ত্র ফিরিয়ে না দাও আমার দিক থেকে, তাহলে আমি যে ওদের কুহকজালে জড়িয়ে পড়ব। আর তাহলে আমি তো অজ্ঞ-মূর্খদের মধ্যে গণ্য হয়ে পড়ব। –সূরা-ইউসুফ-৩৩

হযরত মরিয়ম ছিলেন আল্লাহ্‌র প্রতি অতি বড় ঈমানদার এবং পরকালে দৃঢ় বিশ্বাসী। তিনি সহসা এক সুশ্রী-সুকান্ত যুবককে নিভৃতে একাকী দেখতে পেয়ে আল্লাহ্‌র ভয়ে কেঁপে ওঠেন। তিনি বলে ওঠেনঃ

اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا،

আমি তোমার থেকে খোদার নিকট আশ্রয় চাই–যদি তুমি খোদার ভয়সম্পন্ন লোক হও.....।

এই প্রেক্ষিতেই মহানবী ইরশাদ করেছেনঃ

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهٗ شَابٌّ نَشَاَ فِىْ عِبَادَةِ اللّٰهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَ جَمَالٍ فَقَالَ اِنِّىْٓ اَخَافُ اللّٰهَ وَ رَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. (بخارى، مسلم)

সাতজন লোককে আল্লাহ্ তা'আলা ছায়া দেবেন, যেদিন আল্লাহ্র ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। তাদের মধ্যে একজন হল সেই যুবক যে আল্লাহ্র বন্দেগীর মধ্যেই বর্ধিত হয়েছে। আর একজন সেই পুরুষ, যাকে কোন মর্যাদাসম্পন্ন সুন্দরী নারী ব্যভিচারে প্ররোচিত করে আর সে বলে ওঠেঃ না, আমি আল্লাহ্কে ভয় করি। আর তৃতীয় সেই লোক, যে নীরবে-নিভৃতে আল্লাহ্কে স্মরণ করে ও নিজের কার্যাবলী স্মরণ হওয়ায় তার দুই চোখের পানি প্রবাহিত হতে থাকে। —বুখারী, মুসলিম

আল্লাহ্র ভয়ে ভীত ব্যক্তিদের এই হচ্ছে আদর্শ ভূমিকা। ইসলাম এই ধরনের আদর্শ চরিত্রবান ব্যক্তি তৈরী করে এবং তৈরী লোকদের কাছ থেকে এইরূপ চারিত্রিক দৃঢ়তারই আশা করে।

ইসলাম মানব-মনে গুনাহ্র প্রতি কেবল ঘৃণাই জাগায় না, পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায় ও ভাল-মন্দ সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণাও জাগিয়ে তোলে। ইসলাম জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের জন্যে যেমন বিধান দিয়েছে, তেমনি নারী-পুরুষ সম্পর্কের ব্যাপারেও সুস্পষ্ট ও অকাট্য কথা বলে দিয়েছে। সে জানিয়ে দিয়েছে, কোন্ কোন্ পন্থা ও পদ্ধতি আল্লাহ্র পছন্দ এবং কোন্ কোন্টি নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে যৌন আকর্ষণ হচ্ছে, এই পরীক্ষা-সঙ্কুল বিশ্ব-জীবনে আল্লাহ্র বান্দাদের জন্যে কঠিন পরীক্ষার বিষয়। নারী-পুরুষের পারস্পরিক দুর্দমনীয় আকর্ষণ মানুষকে এক নাজুক পর্যায়ে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। সেখানে তাকে অনড়ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় যে, সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির পথ গ্রহণ করবে, না লালসা-পঙ্কিল পথ অবলম্বন করে আল্লাহ্র গযবে পড়তে প্রস্তুত হবে। নবী করীম (স) এই দিকে ইঙ্গিত করেই বলেছেনঃ

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ (بخاری)

আমার পর পুরুষদের জন্যে নারীদের তুলনায় অধিক বিপদের কারণ আর কিছু রেখে যাইনি আমি। —বুখারী

অপর এক হাদীস মতে প্রতিটি সকাল বেলা দুজন ফেরেশতা ঘোষণা করেঃ পুরুষদের জন্যে নারীরা ক্ষতিকর এবং নারীদের জন্যে পুরুষরা।

নারী ও পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণের প্রেক্ষিতে রাসূলে করীম (স)-এর এসব সাবধান বাণীর তাৎপর্য সহজেই বুঝতে পারা যায়। নারী-পুরুষের মাঝে অবৈধ সম্পর্ক যে কোন মুহূর্তে সংস্থাপিত হতে পারে। কিন্তু তা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি?

রক্ষা পাওয়ার উপায় কি হতে পারে, এ প্রশ্নের জবাব অন্য একটি প্রশ্নের জবাবের উপর নির্ভর করে। সে প্রশ্নটি হল, মানুষ কেন ব্যভিচার করবে? মানুষের মধ্যে স্বভাবতই যৌন লালসা তীব্রভাবে বর্তমান। কিন্তু তার নিরসনের পথ কি উন্মুক্ত নেই? যদি থাকে, তাহলে সে পথেই কেন যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা হবে না? আর যদি না-ই থাকে, তা হলে সে পথ অবাধ ও উন্মুক্ত হবে না কেন?

ইসলাম মানুষের সামনে তাদের স্বাভাবিক যৌন চাহিদা পরিতৃপ্তির জন্যে বৈধ পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। আর তা হচ্ছে বিবাহিত জীবন। এই জীবনে যেমন পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি অর্জন সম্ভব, তেমনি এই পরিতৃপ্তি লাভের অনিবার্য পরিণতি গ্রহণেরও সুষ্ঠু ব্যবস্থা নিহিত। তাই কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ

مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ،

বিবাহিত পুরুষের জীবন......ব্যাভচারীর জীবন নয়।

مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ

বিবাহিত নারীর জীবন.......ব্যাভচারীণীর জীবন নয়।

কুরআনের ভাষায় বিবাহিত জীবন দুর্গ-প্রাচীরের অভ্যন্তরে যাপিত ভয়-শঙ্কামুক্ত জীবন তুল্য। আর অবিবাহিত যৌন জীবন শঙ্কাময় ব্যভিচারী জীবন। উচ্ছৃঙ্খল, প্রাকারবিহীন জীবন। অবিবাহিত যৌন জীবন যেন বাঁধাহীন জলস্রোত। তা শুধু ব্যক্তিকেই ডোবায় না, গোটা জনপদকেও ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

ইসলাম ব্যভিচারকে হারাম করেছে এবং বিবাহকে বৈধ পথ হিসেবে গ্রহণ করেছে। এ থেকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য লাভ সম্ভব। একটি হচ্ছে, যৌন লালসা পরিতৃপ্তির ক্ষেত্রে সংযম অবলম্বন করা এবং কোনরূপ উচ্ছৃঙ্খলতাকে বরদাশ্‌ত না করা, অর্থাৎ একে একটা সীমার মধ্যে নিয়ন্ত্রিত রাখা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, এই নিয়ন্ত্রণ হবে মানবিক মূল্যবোধ তথা নৈতিক চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষার সহায়ক। বস্তুতঃ বিবাহের মাধ্যমেই যৌন অনাচার প্রতিরোধ ও নৈতিক শুচিতা রক্ষা করা সম্ভব। রাসূলে করীম (স) তাই বলেছেনঃ

إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِيْ قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُوَقِعْهَا فَإِنَّ ذٰلِكَ يَرُدُّ مَا فِيْ نَفْسِهِ، (مسلم)

কোন নারী যদি কোন পুরুষকে আকর্ষণ করে এবং তার দিল আকৃষ্ট হয়ে পড়ে (অনুরূপভাবে কোন পুরুষ যদি কোন নারীকে আকর্ষণ করে ও তার মন আকৃষ্ট হয়ে পড়ে) তাহলে তার নিজের স্ত্রী (বা স্বামীর) নিকট চলে যাওয়া উচিত এবং তারই কাছ থেকে স্বীয় চাহিদা পূর্ণ করে নেয়া কর্তব্য। মনে জেগে ওঠা লালসা বা আকর্ষণের প্রকৃত পরিতৃপ্তি এমনিভাবেই সম্ভব।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সদিচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতার একান্ত আবশ্যক। প্রত্যেককেই অপরের ইচ্ছা-বাসনার প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি রেখে চলতে হবে। স্ত্রীকে যেমন স্বামীর দাবি পূরণে প্রস্তুত থাকতে হবে, তেমনি স্বামীকেও সতর্ক থাকতে হবে স্ত্রী যেন অতৃপ্ত থেকে না যায়। এ কারণেই নবী করীম (স) বলেছেনঃ স্বামী যখন স্বীয় স্ত্রীকে কামনা পূরণের আহবান জানাবে, স্ত্রী তার ডাকে অবশ্যই সাড়া দিবে–যদি সে জরুরী কোন কাজে ব্যস্ত থাকে, তবুও।[১] অনুরূপ নির্দেশ স্বামীদের প্রতিও রয়েছে তাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে। হযরত উমর (রা) তাঁর এক ভাষণ প্রসঙ্গে বলেছেনঃ

وَ حَصِّنُوْا فُرُوْجَ هٰذِهِ النِّسَاءِ،

তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের যৌন-অঙ্গের পবিত্রতা অবশ্যই রক্ষা করবে।

উদ্দেশ্যের সহায়ক ব্যবস্থাসমূহ

এ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীদের যৌন কামনা-বাসনা পূর্ণ মাত্রায় চরিতার্থ করা স্বামীদের কর্তব্য। অন্যথায় যৌন অতৃপ্তি স্ত্রীদেরকে অপর পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারে। আরব জাহিলিয়াতের যুগে স্ত্রীদের যৌন কামনা-বাসনা অতৃপ্ত রেখে তাদের শাস্তি দান কিংবা ভিন্ পুরুষের প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে ওঠতে বাধ্য করা হত। ইসলাম এই কাজকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। কেননা এরূপ অবস্থায় স্ত্রীরা বিবাহিতা হওয়া সত্ত্বেও অবিবাহিতাদের ন্যায় অতৃপ্ত থাকতে বাধ্য হয়। বস্তুতঃ ইসলাম নারী-পুরুষের যৌন চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্যে বিবাহকে যে এক দুর্ভেদ্য দুর্গ বানিয়ে দিয়েছে, তা এসব বিবেচনায় সহজেই বুঝতে পারা যায়। এই পর্যায়ে কয়েকটি কথা স্মরণীয়ঃ

১. প্রেম-ভালবাসা যৌন সম্পর্ক স্থাপনের প্রাণস্বরূপ। প্রেম-ভালবাসার বদৌলতেই নারী-পুরুষের যৌন জীবন সুন্দর ও মোহময় হয়ে ওঠে। এরূপ জীবনেই নারী ও পুরুষ পরম শান্তি, স্বস্তি, তৃপ্তি ও নিরাপত্তা লাভে সক্ষম হয়।

---

১. অবশ্য এ নির্দেশ শুধু স্বাভাবিক অবস্থায়ই প্রযোজ্য। স্ত্রী যদি বাস্তবিকই শারীরিকভাবে অসমর্থ হয় কিংবা অসুস্থ থাকে তাহলে এ নির্দেশ প্রযোজ্য নয়। —সম্পাদক

২. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বয়সের পার্থক্য বেশী হওয়া উচিত নয়। কেননা বয়সের পার্থক্য বেশী হলে উভয়ের কেউই অপরের নিকট থেকে সেই তৃপ্তি, সুখ ও আনন্দ লাভ করতে পারবে না, যা সুখী দাম্পত্য জীবনের স্থায়িত্বের জন্যে অপরিহার্য। কোন যুবক সাহাবী একজন বিধবা মহিলাকে বিয়ে করলে নবী করীম (স) বললেনঃ 'তুমি একটি কুমারী মেয়ে বিয়ে করলে না কেন? তাহলে তুমি তাকে নিয়ে আনন্দে খেলা করতে; হাসি-খুশীতে তোমার মন ভরে ওঠত? আর সেও আনন্দ ও সুখ লাভে ধন্য হত?'

একথার তাৎপর্য এই যে, যুবক বয়সের পুরুষ বেশী বয়সের অকুমারী মেয়ের নিকট সাধারণত সেই সুখ ও তৃপ্তি-আনন্দ লাভ করতে পারে না, যা তার জন্যে একান্তই জরুরী। হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা) উভয়ই নবী দুহিতা হযরত ফাতিমা (রা)-কে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে নবী করীম (স) উভয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেনঃ 'তোমাদের দুজনেরই বয়সের তুলনায় সে অতি অল্প বয়সের মেয়ে'। অথচ যুবক হযরত আলী (রা)-র সাথে তিনি নিজে উদ্যোগী হয়েই হযরত ফাতিমার বিয়ে দিলেন।

৩. এই উদ্দেশ্যে বিয়ের পূর্বে বর ও কনের পরস্পরকে দেখার ব্যবস্থা ইসলামী শরীয়াতে বৈধ রাখা হয়েছে, যেন চিরস্থায়ী জীবন-সঙ্গী বাছাই ও গ্রহণের পূর্বে তারা উভয়ই এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত মনে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। নবী করীম (স) বিয়ের প্রস্তাবদাতা একজন পুরুষকে বলেছিলেনঃ

أُنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُودَمَ بَيْنَكُمَا، (ترمذی)

তুমি আগে কনেকে দেখ। তোমাদের পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতা সৃষ্টির জন্যে এই দেখা-সাক্ষাত সহায়ক হবে। —তিরমিযী

এই কথাটি থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গভীর প্রেম-ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপিত হওয়াই ইসলামের কাম্য। দাম্পত্য জীবনে যে-কোনরূপ মনোমালিন্য ও অপ্রীতিকর অবস্থাই বিবাহিত জীবনের লক্ষ্য বিনষ্ট করার জন্যে যথেষ্ট। কেননা এরূপ অবস্থা দেখা দিলেই সতীত্ব, নৈতিকতা ও পবিত্রতার বৈরীশক্তি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার এবং শয়তানী অস্‌অসা দিয়ে স্বামী বা স্ত্রীর পদস্খলন ঘটাবার সুযোগ পায়। এই কারণে নবী করীম (স) এমন অনেক বিয়েই ভেঙ্গে দিয়েছেন, যেখানে স্ত্রী স্বামীর খারাপ মন-মেজাজের জন্যে তার সঙ্গে থাকতে অসম্মতি জানিয়েছে কিংবা স্ত্রীর এ ধরনের দোষে স্বামীর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

৪. দাম্পত্য জীবনে মাধুর্য সৃষ্টি ও স্বামীকে স্ত্রীর প্রতি অধিক আকৃষ্ট করে রাখার জন্যে স্ত্রীর সাজ-সজ্জা ও চাক্‌চিক্যময় মনোহর পোশাক-অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে থাকাকে ইসলাম খুবই পছন্দ করেছে। অথচ এরূপ অবস্থায় গায়র-মুহররাম পুরুষের সামনে বের হওয়াকে আদৌ সমর্থন করা হয়নি; কিন্তু স্বামীর জন্যে এসব করাকে দাম্পত্য জীবনের স্থায়িত্বের কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর ব্যতিক্রম হলে স্বামীর মন স্ত্রীর প্রতি বিরক্ত ও বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। ইমাম শওকানী লিখেছেনঃ

بِاَنَّ ذَوَاتَ الْاَزْوَاجِ يُحْسِنَّ مِنْ هُنَّ التَّزِيْنَ لِلْاَزْوَاجِ،

স্বামীদের জন্যে স্ত্রীদের নানাবিধ অলঙ্কার-ভূষণে ভূষিতা হওয়াকে খুবই উত্তম মনে করা হয়েছে।

বিদেশাগত স্বামীদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন পূর্বাহ্নে আগমনের খবর না দিয়েই হঠাৎ করে ঘরে প্রবেশ না করে। কেননা স্বামীদের অনুপস্থিতির কারণে স্ত্রীরা হয়ত কোনরূপ সাজ-সজ্জা না করে অপরিস্কার-অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় জবু-থবু হয়ে রয়েছে। এই অবস্থায় স্ত্রীকে দেখলে স্বামীর মনে বিরক্তির ভাব জাগতে পারে। আর তা দাম্পত্য জীবনের স্থায়িত্বের জন্যে কিছুমাত্র সহায়ক নয়। তাই দীর্ঘদিন পর বাড়ি ফিরতে থাকলে স্বামীদের কর্তব্য পূর্বাহ্নে খবর দেয়া, যেন স্ত্রীরা তাদেরকে গ্রহণ করার জন্যে রীতিমত প্রস্তুত হয়ে প্রতীক্ষমান হয়ে থাকতে পারে। রাসূলে করীম (স)-এর সে নির্দেশটির ভাষা এইঃ

اَمْهِلُوْا حَتّٰى تَدْخُلُوْا لَيْلاً اَىْ عِشَاءً لِكَىْ تَمْشُطَ الشَّعِثَةُ وَ تَسْتَحِدَّ الْمُغِيْبَةُ. (بخارى، مسلم)

একটু অপেক্ষা কর–এখনই বাড়িতে প্রবেশ করোনা, দেরী করে রাত্রিকালে ঘরে যাবে। এই অবসরে স্ত্রীরা তাদের মাথার বিস্তৃত চুলগুলো আচড়ে নেবে আর তারা গোসল করে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে তৈরী থাকবে।–বুখারী, মুসলিম

৫. ইসলাম যেমন স্বামীর হৃদয়াবেগের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে, তেমনি দিয়েছে স্ত্রীর মন-মানসিকতার প্রতি সম্মান দেখানোর উপর বিশেষ জোর। কেননা স্ত্রী তো নিছক লালসার বহ্নি নির্বাপিত করার একটা হাতিয়ার মাত্র নয়–নয় হৃদয়াবেগশূন্য পাথরের মানবী দেহ। তার হৃদয়-মনে সূক্ষ্ম অনুভূতি তীব্রভাবে বর্তমান। তাই সে অনুরূপ হৃদয়াবেগ দেখতে চায় প্রতিপক্ষের মধ্যেও। স্ত্রীর

ঠুনকো মনের কাঁচে একবিন্দু আঘাত তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার জন্যে যথেষ্ট। আর তা যদি চূর্ণ হয়েই যায়, তাহলে অতঃপর সে একটা মাটির স্তুপ ছাড়া কিছু নয়।

৬. স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক গভীরতর ও মাধুর্যময় করে তোলার জন্যে উত্তম নৈতিকতার শিক্ষা দিয়েছে ইসলাম। তারও প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, পারস্পরিক মত-বিরোধ ও বিরাগ-বিকর্ষণ যেন দাম্পত্য জীবনের একাত্মতাকে বিনষ্ট করে না দেয়। খোদ নবী করীম (স) তাঁর স্ত্রীদের সাথে এমন সব ব্যাপারে একাত্ম হয়েছেন, যা তাকওয়া-পরহেজগারীর প্রচলিত ধারণার বিপরীত মনে হতে পারে। কিন্তু তাও তিনি করেছেন–করা কিছুমাত্র অসঙ্গত মনে করেন নি শুধু এই জন্যে যে, নারীরাও মানুষ–পাথর নয়। এসবের মাধ্যমে দাম্পত্য জীবনের মাধুর্য বৃদ্ধিই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল। এ উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর স্ত্রীদের নানা আনন্দপূর্ণ ও জ্ঞান-গর্ভ গল্প বলেও শোনাতেন। নানা বৈধ আমোদ-প্রমোদ করতে বা দেখাতেও কসুর করতেন না। হযরত আয়েশা (রা) বলেনঃ 'আমি রাসূলের সঙ্গে একত্রে খাবার খেতে বসতাম। খাওয়ার সময় গোশত-ভরা হাড় খানিকটা চিবিয়ে আমি তাঁর পাতে ফেলে দিতাম। তিনি সেটি সেখান থেকেই খেতে শুরু করতেন, যেখান থেকে আমি চিবিয়েছিলাম'। বস্তুতঃ দাম্পত্য জীবনে মাধুর্য সৃষ্টির জন্যে এই ধরনের কার্যকলাপ কিছুমাত্র কম সহায়ক নয়। এক কথায় বলা যায়, দাম্পত্য জীবনকে ইসলাম নিছক কতিপয় ধরাবাঁধা রীতিনীতির মধ্যে সীমিত করে রাখতে চায়নি। তাতে নানাভাবে সৌন্দর্য, মাধুর্য ও আকর্ষণীয় পরিবেশ গড়ে তোলার উপকরণও দিয়েছে।

সতর্কতামূলক ব্যবস্থা

ইসলাম কোন একপেশে ব্যবস্থা নয়। যৌন দাবি-দাওয়া একটা প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বিশেষ। তা কোন্ মুহূর্তে সব কিছু ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে, তা আগে থেকে বলে দেয়া যায় না। এই জন্যে ইসলামী শরীয়াত এক্ষেত্রে বিশেষ জরুরী কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

এসব সতর্কতা মূলক ব্যবস্থার ফলে পাপ ও নাফরমানীর পথ স্বভাবতঃই সঙ্কীর্ণতর হয়ে গেছে। কাজেই সে ব্যবস্থা পালন করে মানুষ যৌন পঙ্কিলতা থেকে সহজেই নিজেকে রক্ষা করতে পারে।

এ পর্যায়ে কুরআন মজীদের একটি আয়াত বিশেষভাবে স্মরণীয়। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

وَ لاَ تَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّ سَآءَ سَبِيْلًا * (بنى اسرائيل: ٣٢)

এবং তোমরা ব্যভিচারের নিকটেও যেও না। কেননা তা অত্যন্ত নির্লজ্জতা ও পাপ-পঙ্কিল এবং অতীব খারাপ পন্থা। –বনী ইসরাইল-৩২

ব্যভিচার পরিহার করে চলার এই নির্দেশটি অতীব জ্ঞানগর্ভ ও তাৎপর্যপূর্ণ। এ নির্দেশে মানুষের মস্তিষ্কের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। ফলে 'ব্যভিচারের কাছেও যেও না' কথাটি শোনা মাত্রই এমন সব দিক শ্রোতার মানসপটে ভেসে ওঠে, যার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের পরিণামে বর্তমান সভ্যতা ব্যভিচারকে অত্যন্ত সহজ করে দিয়েছে। বস্তুতঃ কুরআন লোকদেরকে কেবল ব্যভিচার করতেই নিষেধ করে নি' কার্যত ব্যভিচার ঘটায়–ঘটতে সহজ করে দেয় যেসব ব্যাপার, তাও পরিহার করে চলার নির্দেশ দিয়েছে। এসব ব্যাপারকে সাধারণতঃ দোষণীয় মনে করা হয় না বটে; কিন্তু একটু চিন্তা করলেই নিঃসন্দেহে বুঝতে পারা যায় যে, সেই ব্যাপারগুলো পরিহার করে চললে ব্যভিচারের ন্যায় একটা চরম পাপ কিছুতেই সংঘটিত হতে পারে না। কোন মানুষই হঠাৎ করে বড় ধার্মিক হয়ে যায় না, হঠাৎ করে ধর্মত্যাগীও হয়ে যেতে পারে না কেউ। উভয় ক্ষেত্রেই একটা ক্রমিক গতি বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। প্রতিটি ব্যাপারের পাশ্চাতেই থাকে ঘটনা পরম্পরার ধারাবাহিকতা, যার পরিণামে কেউ ধার্মিক হয়ে যায় আবার কেউ ধর্ম ত্যাগ করে চরম নাফরমান হয়ে পড়ে। ব্যভিচারের ব্যাপারটিও তদ্রূপ। তা একেবারে হঠাৎ ঘটে না। তার জন্যে পূর্ব-প্রস্তুতি ও ক্রমিক আনুকূল্য অবশ্যাম্ভাবী। সেগুলোকে যদি রোধ করা না হয়, বরং তা অবাধ ও অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে, তাহলে তার পরিণতিতে ব্যভিচারের ন্যায় দুর্ঘটনা অবধারিত হয়ে পড়ে। তাই ইসলাম সে পূর্ব-প্রস্তুতি ও ক্রমিক আনুকূল্যের পর্বকে মূলোৎপাটিত করতে চায়। অন্যথায় ব্যভিচার অতীব সাধারণ ও নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে; তা বন্ধ করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। বস্তুত ধ্বংস-গহবরের মুখে পড়ে যাওয়া ব্যক্তিকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সে কারণে ধ্বংসের মুখটি রুদ্ধ করে দেয়া ও সে মুখের পাশ দিয়ে যাতে কেউ পথ না মাড়ায়, তার জন্যে আগে থেকে মানুষকে সর্তক করে দেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কুরআনের পূর্বোদ্ধৃত কথাটি এই পর্যায়েরই।

একটি হাদীসে নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেনঃ (তার মর্ম হচ্ছে)ঃ

মানুষ নানাভাবে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। চক্ষের ব্যভিচার, চলাচলের ব্যভিচার,

মনোবৃত্তির ব্যভিচার এবং কামনা-বাসনার ব্যভিচার। সর্বশেষে যৌন অঙ্গ তাকে সত্যে পরিণত করে কিংবা মিথ্যা করে দেয়। –আবু দাউদ

তার অর্থ, মূল ব্যভিচার কার্যের পূর্বে এসবের মাধ্যমে তার পথ উন্মুক্ত হয়। কাজেই ইসলাম ব্যভিচারকে নিষিদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে এসব পূর্বাহ্নিক কার্যক্রমকেও ব্যভিচার পর্যায়ের কাজ বলে ঘোষণা করেছে এবং এসবকেও হারাম করে দিয়েছে।[১]

দৃষ্টি নত রাখার নির্দেশ

এই পর্যায়ের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা হচ্ছে দৃষ্টি নত রাখার নির্দেশ। চোখে কাউকে ভাল লাগলে তার প্রতি যৌন আকর্ষণ তীব্র হয়ে ওঠা খুবই স্বাভাবিক।

এই কারণে কুরআনে মজীদে ঘোষিত হয়েছেঃ

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ه وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ، (النور: ٣٠-٣١)

হে নবী! মু'মিন লোকদের বলে দাও, তারা যেন নিজেদের চক্ষুকে নত রাখে। তা করে তারা যেন নিজেদের লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করে। তাদের চরিত্রকে পবিত্র ও নিষ্কলুষ রাখার জন্যে এই ব্যবস্থা অতীব কার্যকর। তারা যা কিছু করে, সে বিষয়ে আল্লাহ্ পূর্ণ অবহিত। আর ঈমানদার মহিলাদেরও বলে দাও, তারা যেন নিজেদের চক্ষুকে নত রাখে ও নিজেদের লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করে। –সূরা নূরঃ ৩০-৩১

আয়াতের বাচন-ভঙ্গি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, নারী ও পুরুষ উভয়েরই গায়র-মুহার্‌রাম স্ত্রী-পুরুষদের প্রতি চোখ তুলে তাকাতে নিষেধ করা হয়েছে এজন্যে যে, তা না করলে তাদের লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করা সম্ভব হবে না। লজ্জাস্থানের পবিত্রতা বিনষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে এই দেখা বা দৃষ্টিপাত। এই আয়াতের নির্দেশটির সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নবী করীম (স)-এর একটি হাদীসে। হযরত আলী (রা)-কে লক্ষ্য করে তিনি বলেছেনঃ

১. ব্যভিচারকে একটা নির্দোষ ও আকর্ষনীয় বিষয় রূপে ধরা আধুনিক নাটক-উপন্যাসের একটা বৈশিষ্ট্য। নাটক-উপন্যাস নামক এসব জঞ্জাল থেকে সমাজকে রক্ষা করা সচেতন ঈমানদার ব্যক্তিদের কর্তব্য। —সম্পাদক

يَا عَلِيُّ لَا تَتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولٰى وَ لَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ. (ابو داؤد)

হে আলী! তুমি একবার তাকিয়ে পুনর্বার তাকাবে না। তোমার প্রথম দৃষ্টিপাত ক্ষমার যোগ্য। কিন্তু দ্বিতীয়বার নয়। —আবু দাউদ

অর্থাৎ প্রথম দৃষ্টিপাত আকস্মিক, অনিচ্ছামূলক। কিন্তু তারপর আবার চোখ তুলে তাকানোর অর্থ হচ্ছে, বিপরীত লিঙ্গ তার মনকে আকৃষ্ট করছে এবং তার মনে যৌনতার কৃমি-কীট কিলবিল করে ওঠেছে। তাই একবার যদি কখনও চোখ পড়েই যায়, তাহলে দ্বিতীয়বার না তাকাতে ও চোখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নিতে বলা হয়েছে।

গান-বাজনা শ্রবণ নিষিদ্ধ

চোখের দৃষ্টি যেমন মানুষকে বিপরীত লিঙ্গের দিকে আকৃষ্ট করে, তেমনি করে গানের সুর। মধুর কণ্ঠস্বর মানুষকে মোহাবিষ্ট করে; ফলে ভাল-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্যবোধ সে হারিয়ে ফেলে। এই কারণে ইসলামে গান-বাজনার কোন স্থান নেই। বিশেষ করে সুন্দরী যুবতীর সুমিষ্ট কণ্ঠের গান পুরুষদের জন্যে এবং অনুরূপ পুরুষ কণ্ঠের গান মেয়েদের জন্যে খুবই মারাত্মক হয়ে দেখা দেয়। বস্তুতঃ গান-বাজনা যে মানুষের মধ্যে যৌন উত্তেজনার সৃষ্টি করে, অনস্বীকার্য। এই কারণে বিশেষজ্ঞগণ বলেছেনঃ

فَلِذَالِكَ يُحِثُّ عَلَى الزِّنَا فَبَيْنَ الْغِنَا وَ الزِّنَا تَنَاسُبٌ مِنْ جِهَةٍ إِنَّ الْغِنَا لَذَّةُ الرُّوحِ وَ الزِّنَا لَذَّةُ النَّفْسِ وَ لِهٰذَا جَاءَ فِى الْحَدِيْثِ الْغِنَاءُ رُقْيَةُ الزِّنَا (نقد العلم و العلماء، ص: ٢٣٧)

এই জন্যেই বলা হয়েছে, গান মানুষকে ব্যভিচারে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে গান ও ব্যভিচারের মধ্যে এক প্রকারের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তা এভাবে যে, গান মানুষের আত্মাকে পরিতৃপ্ত করে আর ব্যভিচার মানুষের কুপ্রবৃত্তি বা দৈহিক দাবিকে চরিতার্থ করে। আর এ কারণেই হাদীসে বলা হয়েছেঃ 'গান মানুষকে ব্যভিচারের জন্যে যাদুর মত প্ররোচিত করে'। —আল্লামা ইবনুল জাওজী

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদিতে নারী

পূর্বোক্ত আলোচনার দৃষ্টিতে একথা স্পষ্ট করে বলা যায় যে, বর্তমান সময়ে প্রচলিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদিতে যোগদান নরনারী, বিশেষভাবে যুবতী নারী সমাজের জন্যে খুবই মারাত্মক অবস্থা সৃষ্টির কারণ হতে পারে। সুস্থ ও অনাবিল দৃষ্টিতে দেখলেই স্পষ্টভাবে দেখা যাবে যে, সংস্কৃতির সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা করে এখনকার যুবক-যুবতীদের এক সাংঘাতিক গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসিয়ে নেয়া হচ্ছে। বস্তুতঃ 'সংস্কৃতি' শব্দটি ব্যবহার করে মানুষের মনে এক প্রকারের মোহমুগ্ধতা ও আবিলতার সৃষ্টি করা হচ্ছে। এ শব্দটি শ্রুতিগোচর হলেই চোখের সমুখে ভেসে ওঠে সুসজ্জিত, বর্ণাঢ্য ও আলোকমণ্ডিত সুউচ্চ মঞ্চে আকর্ষণীয় সাজে সজ্জিত যৌন চেতনা-উদ্দীপক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রদর্শণকারী সুন্দর সুশ্রী যুবক-যুবতীর যুগ্ম ও একক নৃত্য-গীতের অনুষ্ঠান। এ সব অনুষ্ঠান শুধু যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলা-মেশারই সুযোগ করে দেয় না, সমস্ত দর্শকবৃন্দকেও যৌন চেতনায় উদ্বেলিত করে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যেতে প্রবলভাবে সাহায্য করে। কোন ঈমানদার নারীর পক্ষে এধরনের অনুষ্ঠানে নর্তকী বা গায়িকা হিসেবে অংশগ্রহণ করা তো দূরের কথা, দর্শক হিসেবে উপস্থিত হওয়ার কথাও কল্পনা করা যায় না। কেননা 'সংস্কৃতি' তো মানুষের মন ও মগজকে পরিশুদ্ধ করে আর চরিত্রকে করে পবিত্র ও নিস্কলুষ। কিন্তু বর্তমান কালের এসব অনুষ্ঠান মানুষকে চিন্তা-বিশ্বাস ও অনুভূতির দিক দিয়ে চরম বিভ্রান্তি ও আবিলতার পঙ্কে নিমজ্জিত করে, তার চরিত্রকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। আর নাটক ও ছায়াছবির প্রতিক্রিয়া ও পরিণতি এর তুলনায় শতগুণ বেশী মারাত্মক। অবিবাহিতা যুবতী কন্যাকে তাতে ভিন্ পুরুষের প্রেমিকা বা স্ত্রী সেজে তদুপযোগী রসালো কথোপকথন ও আচার-আচরণ করতে হয়। ফলে এ দুয়ের মাঝে কলুষতার আবর্ত সৃষ্টি কে রোধ করতে পারে? এর ফলে নৈতিকতার চেতনা ও চরিত্রের বাঁধন যে সম্পূর্ণ শিথিল হয়ে যায় এবং পরস্পর অবাধ ও অবৈধ যৌন সম্পর্ক নিশ্চিতরূপেই গড়ে ওঠে, তা কি খুব যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে বোঝাতে হবে?

এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, মুসলিম নারীর যে মর্যাদা ও দায়িত্ব মহান সৃষ্টিকর্তা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তাতে উপরোক্ত ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি তথা থিয়েটার ও ছায়াছবিতে নায়িকা সাজার কোন অবকাশই থাকতে পারে না। এসবের মাধ্যমে নারী জাতির চরম অপমানই করা হচ্ছে। নারীর রূপ, কণ্ঠ-মাধুর্য ও যৌবনদীপ্ত দেহকে খোলা বাজারে অতি সামান্য মূল্যে যার-তার হাতে

সাধারণ ও গুরুত্বহীন পণ্য-দ্রব্যের ন্যায় বিক্রী করা হচ্ছে। আমাদের নারী সমাজের কি আত্মসম্মান বোধ বলতে কিছুই নেই? এই পর্যায়ে আল্লাহ্‌র এই কথাটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি বলেছেনঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ * (النور: ١٩)

যারা ঈমানদার লোকদের মধ্যে নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা এবং জঘন্য কামুকতা ও যৌনতার ব্যাপক প্রচার ও বিস্তৃতি পছন্দ করবে ও ভালবাসবে, তাদের জন্যে দুনিয়া ও আখিরাতে পীড়াদায়ক আযাব নির্দিষ্ট হয়ে আছে। প্রকৃতপক্ষে কোন্‌টা নির্লজ্জতা তা তোমরা জাননা, আল্লাহ্‌ই জানেন। –সূরা নূর-১৯

পোশাকের গুরুত্ব

নগ্নতা ও উলঙ্গতা একালের একটা অতিবড় ফিত্‌না। তা মানুষের মনে কামনা-বাসনার আগুন জ্বালিয়ে দেয়। নারীদেহের নগ্নতা যে মানুষকে যৌনতার দিকে কতটা বেশী আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ করে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই ইসলাম নগ্নতা ও উলঙ্গতার উপর কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। নারী ও পুরুষের 'সতর' (অবশ্যই আবৃত্ত করে রাখার অঙ্গসমূহ) নির্দিষ্ট করে দিয়েছে এবং কোন অবস্থায়ই যেন তা অনাবৃত না হয়, সে জন্যে প্রবলভাবে তাকীদ করেছে। ইসলাম এমন পোশাক পরিধান করতেও নিষেধ করেছে, যা লজ্জাস্থানসমূহ আবৃত করার পরিবর্তে আরও অধিক উলঙ্গ ও অধিক আকর্ষণীয় করে তোলে।

গায়র-মুহাররাম নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা

নারী-পুরুষের চরিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার জন্যে ইসলাম গায়ের-মুহাররাম নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও যত্রতত্র বা যখন-তখন দেখা-সাক্ষাতকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। বিশেষ করে নীরব-নিভৃতে এই মেলামেশা ও দেখা-সাক্ষাত সহজেই তাদেরকে চরিত্রহীনতার গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত করতে পারে। তাই নবী করীম (স) কঠোর ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেনঃ

لَا تُلْجُوْا عَلَى الْمُغِيْبَاتِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِيْ مِنْ اَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ. (مسلم)

যে-সব নারীর নিকট তাদের মুহররাম পুরুষ উপস্থিত নেই, তাদের নিকটেও যাবে না। কেননা শয়তান মানুষের মধ্যে রক্তের ধারার মতই প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম।

মোটকথা, ব্যক্তিচরিত্র সংরক্ষণ ও তা সুষ্ঠুরূপে গড়ে তোলার জন্যে ইসলাম যে বিধি-বিধান ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে, তা পালন করা ঈমানদার নারী ও পুরুষের অবশ্য কর্তব্য।

সামাজিক সংস্কার ব্যবস্থা

ব্যক্তিদের সমন্বয়েই সমাজ গঠিত হয়। সমাজকে কোন সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন ব্যক্তিদেরকে সেই আদর্শে বিশ্বাসী ও তাতে উদ্বুদ্ধ-অনুপ্রাণিত করে তোলা। এই কারণে ইসলাম তার আদর্শানুযায়ী সমাজ গড়ার জন্যে ব্যক্তি গঠনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। কিন্তু নিছক ব্যক্তি গঠন কখনই আদর্শ সমাজ গঠনের জন্যে যথেষ্ট নয়। তাই ব্যক্তি গঠনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ গঠনের উপর ইসলাম সমান গুরুত্ব দিয়েছে।

প্রতিটি সমাজেরই একটা নিজস্ব সামষ্টিক আদর্শ থাকে এবং সমাজ অবশ্যই চায় তার ব্যক্তিদের সেই আদর্শের বাস্তব প্রতিমূর্তি রূপে গড়ে তুলতে। ইসলামী সমাজও তার ব্যক্তিদের ইসলামী আদর্শানুযায়ী গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। কুরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে এ বিষয়ে স্পষ্ট কথা বলা হয়েছে। নিম্নোদ্ধৃত আয়াত এ পর্যায়ে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণঃ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ*

(الممتحنة: ١٢)

হে নবী! ঈমানদার মেয়েলোকেরা তোমার নিকট এই বিষয়ে বয়'আত করার জন্য যদি আসে যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে একবিন্দু শির্‌ক করবে না, তারা চুরি করবে না–ব্যভিচার করবে না–তাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, (গর্ভপাত বা গর্ভসঞ্চার বন্ধ করবে না) সামনা-সামনি কারুর উপর মিথ্যা দোষারোপ করবে না এবং ন্যায়সঙ্গত কাজে তোমার নাফরমানী করবে না, তাহলে তুমি তাদের এই বয়'আত গ্রহণ কর। আর তাদের জন্যে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাও। কেননা আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল, দয়াবান।

আয়াতটিতে যে সব বিষয়ের প্রতিশ্রুতি নেবার কথা বলা হয়েছে, তা ইসলামী সমাজের মৌলিক ও ভিত্তিগত ব্যাপার। বিশেষ অবস্থার কারণে আয়াতে কেবল ঈমানদার মেয়েদের কথা বলা হলেও মূলত তা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্যেই প্রয়োজন। পুরুষদের কাছ থেকেও এমনি প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে, যেমন নেয়া হয়েছে মেয়েদের কাছ থেকে।

বস্তুত ইসলামী সমাজ বলতে কি বোঝায়, তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি, মানবতার এই কাফেলাকে ইসলাম কোন্ মঞ্জিলে পৌঁছাতে চায়, তার একটা স্পষ্ট ও যথার্থ চিত্র উপরোদ্ধৃত আয়াত থেকে পাওয়া যায়। এহেন সমাজ পরিবেশে কি ধরনের ব্যক্তি গড়ে ওঠে, তাও এ থেকে নিঃসন্দেহে জানা যায়।

সমাজই ব্যক্তিদের জন্যে চলার পথ নির্ধারণ করে, পথ বেঁধে দেয়। ব্যক্তিগণ সেই পথেই চলতে বাধ্য থাকে। সে পথের বাইরে পা রাখতে উদ্যত হলে সমাজ তাকে নির্দিষ্ট পথের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত করে। আর কোন ব্যক্তি সে নিয়ন্ত্রণ মেনে চলতে প্রস্তুত না হলে সমাজই তাকে ঠেলে ফেলে দেয় বাইরে। এটাই স্বাভাবিক এবং এ ব্যাপারে দুনিয়ার কোন সমাজেই ব্যতিক্রম দেখা যাবে না।

ইসলামী সমাজ পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক সমাজ। তার পক্ষে কোনরূপ চরিত্রহীনতাকে বরদাশত্ করা সম্ভবপর হতে পারে না—যেমন চরিত্রহীন সমাজ পারে না কোন চরিত্রবান ব্যক্তিকে সহ্য করতে। অতএব, ইসলামী সমাজ গঠন করতে হলে তাকে সর্বপ্রকার চরিত্রহীনতা, পাপাচার ও খোদার নাফরমানী থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে হবে এবং এমন ভাবে সমাজকে গড়ে তুলতে হবে, যেন সেখানে ব্যক্তির মধ্যে কোনরূপ পাপ-প্রবণতাই মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে।

ইসলাম তার আদর্শানুযায়ী সমাজ গঠনে একটা বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। তা সমাজে আইন জারী করার পূর্বে সেই আইনের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে চায়। এ কারণেই ইসলাম জ্বিনা-ব্যভিচার এবং তার সমর্থক ও উদ্বোধক ভাবধারাকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করে দিতে চায়।

চিন্তা-বিশ্বাস ও মতাদর্শের শক্তি

প্রতিটি সমাজের সাফল্য তার উপর প্রভাবশালী আদর্শ ও চিন্তা-মতাদর্শের মধ্যে নিহিত। চিন্তা-মতাদর্শ অন্তঃসারশূন্য হলে জগতের কোন শক্তিই তার ক্ষতিপূরণ করতে পারে না। পৃথিবীতে আইনের কোন অভাব নেই। কিন্তু শুধু আইন মানুষকে অন্যায় ও পাপকাজ থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়নি। কেননা প্রতি মুহূর্ত মানুষকে বেঁধে রাখা আইনের সামর্থের

ইসলাম এমন চিন্তা-বিশ্বাস ও মতাদর্শ পেশ করে, যা মানুষের উপর সর্বাত্মকভাবে প্রভাব বিস্তার করে, তাকে প্রতি মুহূর্তে নিয়ন্ত্রিত করে। যে লোক এই চিন্তা-বিশ্বাসকে স্বীয় মন-মগজ দিয়ে গ্রহণ করে, সে কি গোপনে কি প্রকাশ্যে, দিনে বা রাতে, লোকদের সম্মুখে বা নিতান্ত নিভৃতে ও একাকীত্বে–কখনই পাপকার্যের প্রতি পা বাড়াতে সাহসী হয় না। কেননা তার মনে প্রতি মুহূর্ত এই ভয় জাগরুক থাকে যে, কেউ না দেখতে পেলেও এবং পুলিশের হাতে ধরা না পড়লেও এমন এক মহান সত্তা তা অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন, যার নিকট বিন্দু পরিমাণ ব্যাপারও গোপন নেই এবং যিনি এজন্যে কঠিন শাস্তি দিবেন।

নৈতিকতার মূল্য ও গুরুত্ব

বস্তুত যে সমাজের ভিত্তিই হবে এই মহান আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান, সে সমাজ যে পবিত্র সমাজ হবে এবং তাতে নৈতিক চরিত্রের মূল্য ও মর্যাদা যে অনেক বেশী ও সবচাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হবে, তাতে কোনরূপ সন্দেহ থাকতে পারে না। এহেন সমাজে নৈতিকতা কেবল একটা মৌখিক ওয়াজ-নসীহতের ব্যাপার হয়েই থাকবে না, তাতে আইন ও রাষ্ট্রশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা অনিবার্য হয়ে দেখা দেবে। প্রতিটি ব্যক্তিই এ সব নৈতিক সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্যকে স্বীয় মান-মর্যাদার অমূল্য সম্পদ বলে মনে করবে। সমাজে সকলের নিকট সম্মানিত ও মর্যাদাবান হয়ে থাকার জন্যে নিজের জান-প্রাণ ও ধন-মালের মতই সে সবের সংরক্ষণ করবে। কেউ যদি তাকে চরিত্রহীনতার পথে টেনে নিতে চায়, তবে সে পূর্ণশক্তিতে তার প্রতিরোধ করবে এবং সে জন্যে যদি এই অপচেষ্টাকারীকে হত্যা করা ছাড়া কোন উপায়ই না থাকে, তাহলে সে তাও করতে দ্বিধাবোধ করবে না। কিন্তু কোন অবস্থায়ই সে তার নৈতিক মূল্যমানকে ধ্বংস হতে দিবে না।

ইসলামী সমাজে ব্যক্তির এই নৈতিক চরিত্র সংরক্ষণ প্রচেষ্টার আবেগ একটা স্বাভাবিক আবেগ এবং এটা তার ব্যক্তিগত মৌলিক অধিকার বলে স্বীকৃত। এই কারণে এখানে কেউ কোন নারীর সতীত্ব নষ্ট করতে উদ্যত হতে পারে না কিংবা কেউ পারে না কারুর নৈতিকতার উপর মিথ্যা দোষারোপ করতে। এ সমাজে কোন চরিত্রহীন ব্যক্তির সেই মান-মর্যাদাও স্বীকৃত নয়, যা একজন চরিত্রবান ব্যক্তির জন্যে হয়ে থাকে।

পাশ্চাত্য সভ্যতায় নৈতিক চরিত্রের আদৌ কোন গুরুত্ব স্বীকৃত নয়। এই কারণে যে যতবড় চরিত্রহীন, তথায় সে ততই বড় মর্যাদার অধিকারী। ফলে সে সভ্যতায় চরিত্রহীনতার প্রেরণাই লাভ করে প্রতিটি ব্যক্তি। কিন্তু ইসলাম এমন

সমাজ গঠন করে, যেখানে চরিত্রহীন ব্যক্তি কোন সম্মানই পাবে না; বরং সেখানে সেই ব্যক্তি তত বেশী ঘৃণ্য ও লাঞ্ছিত, যার চরিত্র যত হীন ও পঙ্কিল। ইসলামী সমাজের পরিবারসমূহের কর্তব্য কেবল এটুকুই নয় যে,তা পরিবারের সব লোকের শুধু খাওয়া-পরা-থাকারই ব্যবস্থা করবে, বরং সেই সঙ্গে সকলের চরিত্র রক্ষা করার–কেউ চরিত্রহীনতার দিকে এগোতে চাইলে সর্বশক্তি দিয়ে তাকে চরিত্রবান রাখার–জন্যে চেষ্টা করাও তার ঐকান্তিক কর্তব্য। এই কারণে ছেলে বা মেয়ে–বিয়ের বয়স হলেই তার বিয়ের ব্যবস্থা করা কর্তব্য বলে ঘোষিত হয়েছে। এখানে কোন বিবাহক্ষম নারী বা পুরুষের পক্ষে 'কুমার' বা 'কুমারী' হয়ে থাকার একবিন্দু অবকাশ নেই। কুরআন মজীদে স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দেয়া হয়েছেঃ

وَ اَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَ الصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ اِمَائِكُمْ

(النور: ٣٢)

তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত, তাদের বিয়ের ব্যবস্থা কর–চরিত্রবান দাস-দাসীদেরও। –সূরা নূরঃ ৩২

অন্য কথায়, ইসলামে নারী বা পুরুষ কারুরই অবিবাহিত থেকে জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। যদি কারুর পক্ষে বিয়ের ব্যবস্থা করা নিজ থেকে সম্ভব না হয়, তাহলে সমাজ ও রাষ্ট্র তার ব্যবস্থা করার জন্যে দায়ী হবে। কেননা নবী করীম (স) ইসলামী সমাজের নেতা ও রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবেই বলেছেনঃ

اَلسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَّ وَلِيَّ لَهُ (ترمذى)

যার কোন অভিভাবক নেই, রাষ্ট্র-সরকারই তার অভিভাবক। –তিরমিযী

চারজন স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি

বয়সের একটা পর্যায় পর্যন্ত পুরুষের মধ্যে যৌনশক্তি ও আবেগ পূর্ণমাত্রায় বর্তমান থাকে। কিন্তু স্ত্রী লোক স্বভাবতঃই বার বার এমন অবস্থার সম্মুখীন হয়, যার দরুণ তার এই যৌন আবেগ নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে। এই কারণে অনেক স্ত্রীই বেশী দিন স্বামীর যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার সামর্থ রাখে না। আবার অনেক স্ত্রী নানা কারণে সন্তান ধারণ করতে পারেন। এই সব কারণে ইসলামী সমাজে পুরুষকে একই সময় একাধিক স্ত্রী রাখার অধিকার দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাও সীমাহীন ও নিঃশর্ত নয়। একই সময়ে মাত্র চারজন স্ত্রী রাখার অনুমতি রয়েছে,

তার অধিক নয়। পুরুষের যৌন প্রয়োজন পূরণ এবং তার সন্তান লাভের জন্যে ব্যক্তি-বিশেষে এই অনুমতির গুরুত্ব কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। তবে যে পুরুষই এক সময়ে একাধিক স্ত্রীর স্বামী হবে, স্ত্রীগণের মধ্যে সর্ববিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতা ও সুষ্ঠু সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা তার অবশ্য কর্তব্য বলে নির্দিষ্ট হয়েছে। কুরআন মজীদে ঘোষিত হয়েছেঃ

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَ ثُلٰثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً (النساء: ٣)

অতএব তোমরা পুরুষরা তোমাদের পছন্দ মত দুই তিন চার–যে ক'জন স্ত্রী গ্রহণ ইচ্ছা তা করবে। আর যদি স্ত্রীদের মধ্যে সুবিচার করতে পারবে না বলে ভয় কর, তাহলে মাত্র একজন স্ত্রী গ্রহণ করবে। –সূরা নিসাঃ ৩

অর্থাৎ একসাথে একাধিক স্ত্রী (চারজন পর্যন্ত) গ্রহণের অনুমতি এই শর্তে দেয়া হয়েছে যে, তাদের মধ্যে পূর্ণ সাম্য ও সুবিচার রক্ষা করতে হবে। তা করতে পারবে না বলে ভয় বা আশঙ্কা হলে একজনই বিধেয়, একাধিক নয়।[১]

স্ত্রী-লোকদের পূনর্বার বিয়ে করার অনুমতি

দৈহিক সামর্থ্য ও যৌন কামনা-স্পৃহার দিক দিয়ে নারী ও পুরুষের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান : পুরুষের সন্তান ধারণের দিক দিয়েও স্ত্রীর সীমাবদ্ধতা সর্বজনবিদিত। এই কারণে পুরুষের জন্যে এক সময়ে একাধিক স্ত্রী রাখার অধিকার দেয়া হলেও একজন স্ত্রীকে একই সময়ে একাধিক স্বামী গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়নি। কিন্তু কোন স্ত্রীলোক যদি কোন কারণে (তালাক বা মৃত্যু) স্বামীহীনা হয়ে পড়ে, তবে তাকে দ্বিতীয় বার স্বামী গ্রহণের অধিকার দেয়া হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, স্বামীহীনা স্ত্রীর পুনর্বার বিবাহিতা হওয়ার উপর বিশেষ তাকীদ ও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই ধরনের স্ত্রীলোকদের পুনর্বার স্বামী গ্রহণ যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হতে পারে, সেজন্যে সমাজকে বিশেষভাবে তাকীদ করা হয়েছে। ইসলামী সমাজে এই বিবাহ খুবই উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে সম্পন্ন হয়ে থাকে–যেন যৌন চেতনাসম্পন্ন কোন নারীই তার স্বাভাবিক স্পৃহার চরিতার্থতা থেকে বঞ্চিত না থাকে।

---

১. এ সম্পর্কে বিস্তৃত অবহিতির জন্যে লেখকের 'পরিবার ও পারিবারিক জীবন' শীর্ষক গ্রন্থের 'একাধিক স্ত্রী গ্রহণ' আধ্যায়টি দ্রষ্টব্য। — সম্পাদক

তালাকের ব্যবস্থা

ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ের আসল উদ্দেশ্য হল নারী-পুরুষের যৌন জীবনকে সুসংহত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে সুখী ও শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া। এজন্যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও আন্তরিক সৌহার্দ্য অত্যন্ত জরুরী শর্ত। কিন্তু কোন কারণে যদি স্বামী-স্ত্রীতে বনিবনা না হয়, তাহলে উভয়কে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার অধিকার দেয়া হয়েছে, যেন প্রত্যেকেই অন্যত্র সুখ ও শান্তির সন্ধান করে নিতে পারে। শুধু যৌন শক্তি না থাকা বা সম্প্রীতি না হওয়ার দরুণই নয়, কারুর দেহে কোন ঘৃণ্য সংক্রামক রোগ দেখা দিলেও পরস্পরকে ত্যাগ করার অধিকার রয়েছে। কেননা এ সবের কারণে পারস্পরিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির অবমাননা হতে পারে। আর তাহলে বিবাহিত জীবনের লক্ষ্যই নষ্ট হয়ে যায়। তবে কোন সঙ্গত কারণ ছাড়াই বিয়ে ভেঙ্গে দেয়াকে আদৌ সমর্থন দেয়া হয়নি। নবী করীম (স) বলেছেনঃ

اَلْمُنْتَزِعَاتُ وَالْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ، (نسائى)

যেসব স্ত্রীলোক সঙ্গত কারণ ছাড়াই স্বামী পরিত্যাগ করতে সচেষ্ট হয়, তারা মুনাফিক। —নাসায়ী

অপর হাদীসে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

اَيُّمَا اِمْرَاَةٍ سَاَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَاْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ-

কোন প্রকৃত কারণ ব্যতীত যে স্ত্রী লোক স্বামীর নিকট তালাক চাইবে, তার জন্যে জান্নাতের সুগন্ধিও হারাম হয়ে যাবে।

তৃতীয় এক হাদীসে বলা হয়েছেঃ

اِنَّ اَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللّٰهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ اِمْرَاَةً فَلَمَّا قَضٰى حَاجَتَهُ طَلَّقَهَا وَذَهَبَ بِمَهْرِهَا، (مستدرك حاكم)

যে ব্যক্তি বিয়ে করে স্ত্রীর নিকট থেকে স্বীয় যৌন কামনা-বাসনা চরিতার্থ করল এবং তার পরে তাকে বিনা কারণে তালাক দিয়ে দিল, মহরানাও মেরে দিল, সে আল্লাহ্‌র নিকট কঠিন ও অতিবড় গুনাহ করল।

—মুস্তাদরাকে হাকেম

ইসলামী সমাজে নারী-পুরুষের অবৈধ সম্পর্ক যেমন নিষিদ্ধ ও অসমর্থনীয়, তেমনি বৈধ সম্পর্ক খুবই সম্মানজনক ও শ্রদ্ধেয়। এই কারণে কুরআন মজীদে ঘোষণা করা হয়েছেঃ 'স্বামীসম্পন্ন মেয়েলোকেরা তোমাদের জন্যে হারাম।' তা হালাল নয় এই জন্যে যে, তা হালাল হলে নারী-পুরুষের বৈধ সম্পর্ক অচল ও বিঘ্নিত হয়ে যাবে। নবী করীম (স) বলেছেনঃ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ اِمْرَأَةً عَلٰى زَوْجِهَا۔

যে লোক কোন স্ত্রীলোককে তার স্বামীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও বিরক্ত-বিমুখ বানায়, সে আমার সমাজভুক্ত নয়।

সামাজিক চেতনা

মানুষ যেমন পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত, তেমনি পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তারকারীও। সমাজের কোন লোক উন্নত চরিত্রে ভূষিত হলে তার প্রভাবে সমাজের অন্যান্য লোকও গভীরভাবে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হয়। পক্ষান্তরে চরিত্রহীন ব্যক্তিও প্রভাবহীন থাকে না। এই কারণে ইসলাম প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে এই চেতনা জাগ্রত করতে চায় যে, সে সমাজের একজন স্থপতি–সমাজের নির্মাতা। তার ভাল বা মন্দ হওয়ার উপর সমাজের ভাল-মন্দ নির্ভর করে। অতএব, তাকে শুধু ব্যক্তিগতভাবে চরিত্রবান হলেই চলবে না, চরিত্রের শিক্ষাগুরুও হতে হবে। এই পর্যায়ে নবী করীম (স)-এর একটি দীর্ঘ হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তিনি বলেছেনঃ

اَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ فَالْاِمَامُ الَّذِىْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ وَ الرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ وَ الْمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهٖ وَ هِىَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَ عَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلٰى مَالِ سَيِّدِهٖ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ اَلَا فَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ (بخارى)

জেনে রেখ হে মানুষ! তোমাদের প্রতিটি ব্যক্তিই দায়িত্বশীল এবং সে দায়িত্বের ব্যাপারে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে। জনগণের নেতা–প্রশাসকও দায়িত্বশীল। সেও তার এই দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। প্রতিটি সাধারণ

ব্যক্তি তার ঘরের লোকজনের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। সেও এই দায়িত্বের জন্যে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরে সাধারণভাবে সব লোকজনের এবং বিশেষভাবে তার সন্তানদের ব্যাপারে দায়িত্বশীলা। এ বিষয়ে তাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। প্রতিটি ব্যক্তির দাস বা চাকর (কর্মে নিয়োজিত)ও তার মনিবের ধন-মালের জন্যে দায়িত্বশীল। সেও তার এ দায়িত্বের জন্যে জিজ্ঞাসিত হবে। মোটকথা, সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিই কোন-না-কোন জিনিসের দায়িত্বশীল এবং তাকে সে দায়িত্বের ব্যাপারে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। –বুখারী

বস্তুত সমাজের চাপ খুবই সুদৃঢ় ও অপ্রতিহত। সমাজ যদি কাউকে নৈতিকতার মূল্যমান ক্ষুণ্ণ ও চূর্ণ করার অনুমতি বা সুযোগ না দেয়, তা হলে কারুর পক্ষেই তেমন কোন কাজ করা সম্ভবপর হতে পারে না। কিন্তু সমাজের সাধারণ পরিবেশই যদি খারাপ হয়ে যায়, তাহলে চারিদিকে চরিত্রহীনতা তথা ফিস্‌ক্-ফুজুরীর প্লাবন বয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। ইসলাম সমাজ-সমষ্টির নৈতিক চেতনাকে সর্বাধিক মাত্রায় জাগ্রত ও শক্তিশালী করে দেয়। তাই সামান্য চরিত্রহীনতাকেও ইসলামী সমাজে বরদাশ্‌ত করা হয় না। এই কারণে কোন নারী চিত্তহারী পোশাক পরে, যৌন উত্তেজক প্রসাধন ও সুগন্ধি ব্যবহার করে যথেচ্ছ চলাফেরা করবে–ইসলামী সমাজে তার সামান্যতম সুযোগ দেয়া হয়নি। পাড়া-প্রতিবেশীর অধিকার পর্যায়ে প্রতিবেশীর স্ত্রীর চরিত্র রক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং তার চরিত্র নষ্ট করা ও তার সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনের উপর চরম অভিশাপ উচ্চারণ করা হয়েছে। নবী করীম (স) বলেছেনঃ 'দশজন নারীর সাথে ব্যভিচার করা অপেক্ষাও প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা অতি বড় গুনাহ'। –মুসনাদে আহমদ

ইসলামী আইনের শাসন

ইসলাম নৈতিক শিক্ষা ও সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আদর্শ চরিত্রের ব্যক্তি গঠনের মাধ্যমে গোটা সমাজকে তারই ভিত্তিতে গড়ে তুলতে চায়। এ পর্যায়ে আইনের প্রয়োগ সর্বশেষ ও চূড়ান্ত ব্যবস্থা।

মানুষ জন্মগতভাবেই নিজের বাপ-মা, ছেলে-মেয়ে ও ভাই-বোন প্রভৃতি অতি আপনজনের কাছে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়ে থাকে এবং একত্রে জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। আর এটাই হল প্রতিটি মানুষের নিকটতর পরিবেশ। এই পরিবেশ কেউ নিজে রচনা করে না, স্বাভাবিকভাবেই তা লাভ করে। এই পরিবেশ ভিন্ন মানুষের জীবন যাপন সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং কল্পনাতীত। এই

পরিবেশই প্রতিটি মানব সন্তানের লালিত-পালিত ও বিকশিত হওয়ার আনুকূল্য ও সহায়তা দেয়। এ কারণে এই পরিবেশে পারস্পরিক যৌন সম্পর্ক স্থাপনের আদৌ কোন অবকাশ রাখা হয়নি। রক্ত-সম্পর্কযুক্ত এই নিকটাত্মীয়দের পারস্পরিক বিবাহ সম্পূর্ণ হারাম করে দেয়া হয়েছে, যেন মানব সন্তান জন্মকাল থেকেই একটি যৌন কলুষতামুক্ত ও পবিত্র পরিবেশের মধ্যে লালিত-পালিত ও বর্ধিত হয়ে উঠতে পারে। এই সীমাবদ্ধ ও নির্দিষ্ট পরিবেশের বাইরে নারী-পুরুষের মধ্যে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের অনুমতি রয়েছে কেবলমাত্র বিবাহিত হয়ে। কেননা বিবাহের মাধ্যমেই মানুষ যৌন জীবনের অনিবার্য পরিণতি ও তৎসংক্রান্ত দায়-দায়িত্বের মুকাবিলা করতে প্রস্তুত হতে পারে। এই কারণে বিবাহ সব সময় প্রকাশ্যভাবে, সমাজ চক্ষুর সামনে ও তার সমর্থনক্রমে অনুষ্ঠিত হতে হবে। তা হলেই বিয়ের দায়িত্ব পালনে গোটা সমাজ ব্যক্তির সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করতে প্রস্তুত হতে পারে। এই সহযোগিতা ব্যক্তির জন্যে অত্যন্ত জরুরী। ব্যক্তি তার বৈবাহিক দায়-দায়িত্ব পালনে কোনরূপ গাফলতি করলে সমাজই তাকে এজন্যে বাধ্য করতে পারে।

এই কারণে ইসলামী সমাজে গোপন বিয়ে কিংবা বিবাহহীন যৌন সম্পর্ক স্থাপনের অবকাশ রাখা হয়নি। কুরআন মজীদে দুটি আয়াতে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে বিয়ের উল্লেখ করে গোপন বন্ধুত্বকে সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

وَ لَا مُتَّخِذَاتِ اَخْدَانٍ (النساء)

অর্থাৎ মেয়েরা গোপন প্রণয়কারিণী হবে না। —নিসা

وَ لَا مُتَّخِذِىْ اَخْدَانٍ (المائدة)

অর্থাৎ পুরুষরা গোপন প্রণয়কারী হবে না। —মায়েদা

দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ সমাজের চাপ উপেক্ষা বা পরিহার করে এইসব গোপন বন্ধুত্বে উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকে। পরিবেশের বন্ধন ও যৌন সম্পর্ক স্থাপনের অনিবার্য পরিণতি ও দায়-দায়িত্ব মেনে চলতে প্রস্তুত হয় না বলেই সে গোপন প্রণয়ে প্ররোচিত হয়। এই উচ্ছৃঙ্খলতা ইসলামে আদৌ সমর্থণীয় নয়। এমনকি কেবলমাত্র একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোকের সম্মুখে অনুষ্ঠিত বিয়েও ইসলামী সমাজে সমর্থনযোগ্য বিবেচিত হতে পারে না। আর এ কারণে ইসলামী সমাজে বেশ্যা প্রথারও কোন অবকাশ নেই। কেননা বেশ্যা প্রথা মানুষের চরিত্র ধ্বংস করে; বিবাহিত ও পারিবারিক জীবনের প্রতি মানুষকে করে বীতশ্রদ্ধ। ইসলাম৮-

পূর্ব জাহিলিয়াতের জমানায় বেশ্যাবৃত্তির যে সব আড্ডা বানিয়ে রাখা হয়েছিল, ইসলাম তা সমূলে উৎখাত করেছে। ইসলামী সমাজে কোন লোক তার স্ত্রী কিংবা দাসীকে এই কাজে নিযুক্ত করতে পারে না। এই ধরনের লোক ইসলামী সমাজে বসবাস করারও যোগ্য বা অধিকারী নয়।

পূর্বেই বলেছি, নারী-পুরুষের যৌন চরিত্র পবিত্র রাখার উদ্দেশ্যে ইসলাম তাদের অবাধ মেলামেশাকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিয়েছে। কেননা এই অবস্থা নারী-পুরুষের চরিত্রকে ধ্বংস না করে ছাড়ে না। একই অফিসে বা ক্লাবে, একই কারখানায় বা একই ক্ষেত্রে নারী পুরুষের একত্রে–ঘনিষ্ঠ হয়ে কাজ করা ইসলামী সমাজে চলতে পারে না। আগুন আর শুষ্ক কাষ্ঠের পাশাপাশি অবস্থান যে সর্বধ্বংসী প্রলয়ের সৃষ্টি করবে, তাতে কার সন্দেহ থাকতে পারে? প্রয়োজনে নারীদেরও ঘরের বাইরে যাওয়ার ও পথে-ঘাটে চলাফেরা করার অধিকার আছে; কিন্তু ভিন্ পুরুষদের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে চলাফেরার কোন অনুমতি নেই। হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছেঃ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى اَنْ يَّمْشِيَ الرَّجلُ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ

(ابو داؤد)

কোন পুরুষ দুইজন গায়র-মুহাররাম মেয়েলোকের মাঝখানে বা তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে চলবে, তা নবী করীম (স) নিষেধ করে দিয়েছেন। –আবু দাউদ

এই কারণে ইসলামী সমাজে নারীদের পথে-ঘাটে অবাধে ও যত্রতত্র যাতায়াতকে পছন্দ করা হয়নি। হযরত আলী (রা) একবার লোকদের বলেছিলেনঃ

اَلاَ تَسْتَحْيُوْنَ فَاِنَّهٗ بَلَغَنِىْ اَنَّ نِسَائَكُمْ يَخْرُجْنَ فِي الْاَسْوَاقِ يُزَاحِمْنَ الْعُلُوْجَ. (ابوداؤد)

আমি জানতে পেরেছি, তোমাদের মেয়েরা বাজারে বের হয়ে পর-পুরুষের ভিড়ের মধ্যে পড়ে যায়। এতে কি তোমাদের লজ্জা করে না? –আবু দাউদ

অপর এক হাদীসে বলা হয়েছেঃ

وَ الْمَرْأَةُ اِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَ كَذَا يَعْنِىْ زَانِيَةٌ (ترمذى)

যে মেয়েলোক সুগন্ধি মেখে পুরুষদের মজলিসে গিয়ে সংমিশ্রিত হয়, সে তো যা-তা অর্থাৎ ব্যভিচারিণী। –তিরমিযী

সুগন্ধি ব্যবহার করে মজলিসে গিয়ে নামাযে শরীক হতেও নবী করীম (স) মেয়েদের কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন। –আবু দাউদ

আল্লামা ইবনুল হুম্মাম লিখেছেনঃ

আমরা যখন বলি যে, নারীদেরও ঘরের বাইরে যাওয়ার অধিকার আছে, তখন সেই সঙ্গে একথাও বলি যে, তারা চিত্তহারী সাজ-সজ্জা করে বাইরে যাবে না। পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণমূলক কোন ভাব-ভঙ্গিও গ্রহণ করতে পারবে না। (فتح قدير) বরং সর্বাঙ্গ ও মুখাবয়ব সম্পূর্ণ আবৃত করেই মেয়েদের ঘরের বাইরে যাওয়া উচিত।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম লিখেছেনঃ

হাটে-বাজারে, উন্মুক্ত স্থানে ও পুরুষদের সমাবেশে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা বন্ধ করে দেয়া সরকারের কর্তব্য। অবাধে মেলামেশা করতে দিলে সরকার বা কর্তৃপক্ষকে আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহি করতে হবে। কেননা তা এক কঠিন বিপদের কারণ।

নবী করীম (স) বলেছেনঃ

পথে-ঘাটে মেয়েলোকদের কর্তব্য হচ্ছে পুরুষদের এড়িয়ে পাশ কাটিয়ে চলা। নারীদের ভূবন মোহিনী সাজ-সজ্জায় সজ্জিত হয়ে এবং নগ্নপ্রায় পরিচ্ছদ পরিধান করে ঘরের বাইরে যাওয়া থেকে বিরত রাখাও সরকারের কর্তব্য। –আত্‌তুরুকুল হুকমিয়া

নগ্নতা ও অশ্লীলতা বন্ধ করণ

নগ্নতা, অশ্লীলতা ও পাপাচারের ব্যাপক প্রচার নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার চাইতে কোন অংশেই কম মারাত্মক নয়। মানুষের সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন চিন্তাশীলতাকে বিভ্রান্ত করার ব্যাপারে সিনেমা, রেডিও, টিভি, পত্র-পত্রিকা ইত্যাকার মাধ্যমগুলোর প্রচারণা খুব বেশী প্রভাবশীল হয়ে থাকে। এদের প্রচার-প্রোপাগাণ্ডাই মানুষের মন-মগজ গঠন করে, তাকে সক্রিয় রাখে। আর এই মন-মগজকে কোন্ পথে প্রয়োগ করতে হবে, তাও নির্ধারণ করে দেয় এই প্রচার মাধ্যমসমূহ।

প্রচার মাধ্যমসমূহ যৌন উত্তেজনামূলক প্রচারণায় মশ্‌গুল ও ব্যতিব্যস্ত থাকলে সেই পরিমণ্ডলে কারুর পক্ষেই সৎ ও পবিত্র জীবন-যাপন করা সম্ভব হতে পারে না। কেননা মানুষের মন-মানসে সিনেমা, রেডিও, টেলিভিশন ও পত্র-পত্রিকার প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। যে সমাজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে নৈতিক চরিত্রের পবিত্রতা সম্পর্কে কোন ধারণাই পোষণ করা হয় না, বেতার যন্ত্র, টেলিভিশন ও পত্র-পত্রিকা চরিত্রহীনতা ও অশ্লীলতার প্রচার চালায়—সাহিত্য ও সংস্কৃতির নামে যেখানে যৌন-উত্তেজক পরিবেশ অহর্নিশ গড়ে উঠছে, সেখানে মানুষ ব্যভিচারের কর্দমাক্ত খাদে নিপতিত হবে না, তা কল্পনা করাও অসম্ভব। যে সমাজে দিন-রাত ঘরে-বাইরে-নিভৃত-একাকীত্বে ও প্রকাশ্য জন-সমাবেশে লালসা চরিতার্থ করার নির্বিরোধ আহবান ও আকর্ষণ বিদ্যমান, সে সমাজে মানুষ পাশবিকতায় লিপ্ত হলে বিস্ময়ের কোন কারণ নেই।

ইসলামের পূর্বে আরব-জাহিলিয়াতের অবস্থা এমনিই ছিল। সেই পঙ্কিল পরিবেশকে পবিত্র ও শুচি-শুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে কুরআন মজীদ ঘোষণা করলঃ

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

(النور: ١٩)

যে সব লোক ঈমানদার লোকদের মধ্যে নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার প্রচার পছন্দ করে, তাদের জন্যে ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানেই কষ্টদায়ক আযাব নির্দিষ্ট হয়ে আছে। (কোনটা নির্লজ্জতা ও অশ্লীল) তা আল্লাহ্‌ই জানেন, তোমরা জান না। —সূরা নূর-১৯

অতএব আল্লাহ্‌ যাকে অশ্লীল ও নির্লজ্জতা বলে চিহ্নিত করে দিয়েছেন, তার প্রচার কোন ঈমানদার লোকই বরদাশ্‌ত করতে পারে না—চাইতে বা পসন্দ করতেও পারে না। তাই ইসলামী সমাজে এই নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার প্রচারকে আদৌ সমর্থন করা হয়নি। শুধু তা-ই নয়, তার জন্যে শাস্তিও নির্দিষ্ট হয়ে আছে। এমনকি স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক যৌন কার্যাবলীর প্রচার করাও নিষিদ্ধ।[১]

১. ইসলাম ব্যভিচারকে অমার্জনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করেছে প্রধানতঃ মানুষের নৈতিক স্বাস্থ্যকে অক্ষুন্ন রাখার প্রয়োজনে। কিন্তু ব্যভিচার যে দৈহিক স্বাস্থ্যের জন্যেও অত্যন্ত ভয়াবহ ব্যাপার তা গনোরিয়া, সিফিলিস ইত্যাকার কুৎসিত যৌন ব্যধিগুলো ছাড়াও পশ্চিমী জগতে (পরের পৃষ্ঠায়)

এভাবেই ইসলাম ব্যভিচারের সম্ভাব্য সব পথ বন্ধ করে দিয়েছে। এতৎসত্ত্বেও কোন ব্যক্তি যদি এই অপরাধ করার দুঃসাহস দেখায়, তাহলে পূর্ণ শক্তিতে তাকে দমন করা ও ব্যভিচারকে চিরতরে নির্মূল করে দেয়া একান্তই বিধেয়। যে সব লোক সমাজকে কলুষিত করতে বদ্ধপরিকর, সমাজ থেকেই তাদের বিতাড়িত করতে হবে। এই পথে যে লোক যতটা ধৃষ্টতা দেখাবে, ইসলামের আইন তার জন্যে ততটা কঠোর ও নির্মম হয়ে দেখা দিবে, এটাই স্বাভাবিক। নারী-পুরুষের অবৈধ প্রেম চর্চাকারীকে নির্বাসিত করা এবং যারা কার্যতঃ ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাদের প্রকাশ্যভাবে দোররা মেরে শাস্তি দিতে হবে। আর যে লোক বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও যৌন কামনা পরিপূরণে অবৈধ পন্থা অবলম্বন করবে, ইসলামী সমাজে তার বেঁচে থাকারও অধিকার স্বীকৃত হতে পারে না। কুরআন মজীদে এই পর্যায়ে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

اَلزَّانِيَةُ وَ الزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَّ لَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ (النور:٢)

ব্যভিচারী নারী ও পুরুষ প্রত্যেককেই একশ'টি করে দোররা মারো এবং আল্লাহ্‌র দ্বীনের আইন কার্যকর করার ব্যাপারে এতদুভয়ের প্রতি কোনরূপ অনুকম্পা যেন তোমাদের বিচলিত না করে–যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাক। আর এই দুই জনের শাস্তি একদল মুমিন প্রত্যক্ষ করবে। –সূরা নূরঃ ২

নবী করীম (স) এই আয়াতের ব্যাখ্যা করে বলেছেন, এই শাস্তি অবিবাহিত ব্যভিচারীদের জন্যে। কিন্তু যারা বিবাহিত, তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তাদের জন্যঃ

جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ (مسلم)

(আগের পৃষ্ঠার পর)
'এইডস' (AIDS) নামক মরন-ব্যধির আবিষ্কারে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমান করে দিয়েছে। তাই ব্যভিচার প্রবন পশ্চিমী সমাজও এখন 'এইডস' থেকে বাঁচার জন্যে ধর্মীয় অনুশাসন মানার প্রয়োজনীয়তার কথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। ব্যভিচার সম্পর্কে ইসলামের কঠোর মনোভাব যে কত যুক্তিযুক্ত ও বিজ্ঞানসম্মত, পশ্চিমী জগতের এ স্বীকৃতি তা অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছে। —সম্পাদক

একশ'টি দোররা মারার পর প্রস্তরাঘাতে জীবন হরণ। অবশ্যই পাথর মেরে জীবন হরণের পূর্বে দোররা মারতেই হবে, এমনটা অনেকেই জরুরী মনে করেননি।

এই দীর্ঘ ও বিস্তারিত আলোচনা থেকে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, যৌন স্বাদ-আস্বাদনের স্বাভাবিক স্পৃহাকে ইসলাম একটা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। আর তা হল বিবাহিত জীবন। বিবাহহীন অবস্থায় নারী-পুরুষের যৌন মিলন নিতান্ত পাশবিকতা, মানব সমাজে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। এই অপরাধ দমন করার জন্যে তার উদ্বোধক সব পথকে রুদ্ধ করে দেয়া ঈমানদার মুসলমানের পরম দায়িত্ব।

মোট কথা, ইসলাম মানুষকে পবিত্র ও চরিত্রসম্পন্ন করেই জীবিত রাখতে চায়। যারা চরিত্রের পবিত্রতা বিনষ্ট করতে সচেষ্ট, ইসলাম তাদের আদৌ বরদাশ্‌ত করতে প্রস্তুত নয়। কেননা, তারা মানবতার দুশমন।

“মানবিক সম্মান ও মর্যাদার বিচারে নারী ও পুরুষের মাঝে কোনই পার্থক্য বা ভেদাভেদ নেই। নারীকে শুধু নারী হিসাবে জন্মাবার কারণে পুরুষের তুলনায় হীন ও নীচ মনে করা সম্পূর্ণ জাহেলী ধ্যান-ধারণা, এরূপ চিন্তা-ভাবনা ইসলাম স্বীকার করে না।”

“মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রের পাশ্চাত্য সমাজ দর্শনের অনুসরণ করে নারীদের কোনরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা ও নগ্নতার প্রচলন করা, নারীদের ঘর থেকে টেনে বের করে এনে পুরুষদের মধ্যে একাকার করে দিয়ে, এক নির্লজ্জ পরিবেশের উদ্ভাবন কোনক্রমে সমর্থনযোগ্য নয়।”

“বর্তমান পাশ্চাত্য সমাজ কখনই মুসলমানদের জন্য অনুসরণীয় হতে পারে না।”

– মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.)



খায়রুন প্রকাশনী ©